বাংলাদেশ মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৫

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ, বহুদলীয়, সংসদীয় গনতন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় বহাল থাকেন। যদিও অধিকাংশ আর্ন্তজাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থার মতে ওই নির্বাচন ছিল বিতর্ক এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে বর্থ্য হয়। নির্বাচনের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সারাদেশে কয়েকমাস ধরে যান চলাচল অবরোধ করে এবং সাধারণ ধর্মঘট পালন করে যা ব্যাপক সংঘর্ষে রূপ নেয়। এছাড়া ভোট জালিয়াতি এবং নানমুখী হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে বিএনপি এপ্রিলে শুরু হওয়া স্থানীয় সরকরার নির্বাচন থেকেও মাঝপথে সরে দাড়াঁয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতৃপক্ষ আইন -শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রন করতে বর্থ্য হয়।

মানবাধিকার সমস্যাগুলোর মধ্যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, ধর্মনিরেপেক্ষ ব্লগার ও ভিন্নমতাবলম্বীদের খুন, অনলাইনে মত প্রকাশ এবং প্রেসের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ, জোর পূর্বক বাল্যবিবাহ এবং বিশেষ কিছু লিঙ্গের প্রতি সহিংসতা, এবং শ্রমিকের অনিরাপদ কর্মস্থল ও অধিকার লঙ্ঘন ছিল সবচেয়ে উল্ল্যেখযোগ্য।

অন্যান্য মানবাধিকার সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর নির্যাতন ও অন্যান্য লঙ্ঘন, নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং আটক, দুর্বল বিচারিক ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগের খর্বিত স্বাধীনতা, এবং বিচারের আগেই দীর্ঘ সময় আটকে রাখা। কতৃপক্ষ নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আন্তদলীয় কোন্দল গুরুতর সমস্যা হিসাবে রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে দুর্নীতিও বিদ্যমান একটি সমস্যা। কিছু বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) কাজ করতে গিয়ে নিয়মিতভাবে আইনি এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। নারী ও মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। অনেক শিশু জীবিকার তাগিদে অথবা পাচারের শিকার হয়ে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। শিশু শ্রমিকদের প্রায় সহিংসতা এবং নির্যাতনের শিকার হতে দেখা গেছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্য ছিল গুরুতর একটি সমস্যা। বিশেষকরে সরকারি স্কুলে ভর্তির সময় প্রতিবন্ধী শিশুরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালুগুদের প্রতি সামাজিক নিপীড়ন অব্যাহত ছিল, যদিও অনেক সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং নাগরিক সমাজের নেতাদের মতে এ ধরণের ঘটনার জন্য শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা সংযুক্ততাকে পুরোপুরি দায়ী করা উচিত হবে না কারণ এর পেছনে রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। লিঙ্গ কেন্দ্রিক বৈষম্য বিরাজমান ছিল।

আইনের শাষণ তোয়াক্কা না করে অনেক সরকারি কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিবিশেষ অবাধে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং দায়মুক্তি লাভ করেছে। এর ফলে তারা নাগরিককে তার প্রাপ্য অধিকার দাবি করা থেকেও বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে। আইনশৃঙ্খলারক্ষকারী বাহিনীর নির্যাতন এবং হত্যাকান্ডের বিষয়ে তদন্ত ও মামলার ক্ষেত্রে সরকার সীমিত পদক্ষেপ নিয়েছে।

সেকশন ১. ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রতি সম্মান, যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থেকে মুক্তি নিশ্চিত করবে:

ক) নির্বিচারে নাগরিকের বাঁচার অধিকার হরণ

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে।

কিন্তু গণমাধ্যম এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টে বলা হচ্ছে সরকার এবং তার এজেন্ট অনেক বিচারবহির্ভূত এবং অবৈধ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে আগে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে তারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে শূণ্য সহনশীলতা প্রদর্শন করবেন এবং নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরোদ্ধে আনা সকল বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে কত মানুষ খুন হয়েছে তার কোন পরিসংখ্যান সরকার প্রকাশ করেনি। এমনকি সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো ত দন্তে কোন সমন্বিত উদ্যোগও নেয়া হয়নি। অল্প কিছু সংখ্যক ক্ষেত্রে যেখানে সরকার অভিযোগ গঠন করেছে এবং যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; কিন্তু বছর শেষে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা স্থগিত অবস্থায় ছিল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু সদস্য দায়মুক্তি পেয়েছেন। সরকার আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) এর একটি আভ্যন্তরীন তদন্ত সেলের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। এ সেল র‍্যাবের বিরুদ্ধে আনীত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো তদন্ত করে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের অব্যাহত প্রশিক্ষণ দেয়ার পরও এ সেল এ বছর মাত্র ১৬টি মামলা তদন্ত করেছে, যেখানে ২০১৫ সালে ২৫টি মামলা তদন্ত করা হয়েছিল।

আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী কতৃক পরিচালিত অভিযান এবং গ্রেফতারের সময় সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বাহিনীগুলো প্রায় এই দাবী করে থাকে যে তারা তাদের হেফাজতে থাকা সন্দেহভাজনকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অথবা সহযোগী অপরাধীদের ধরার জন্য গভীর রাতে অপরাধ ঘটার স্থল অথবা গোপন স্থানায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তির সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করলে সে মারা যায়। সরকার এই ধরণের মৃত্যুকে সাধারনত “ক্রসফায়ার” “বন্দুক যুদ্ধ” বা “এনকাউন্টারে” মৃত্যু বলে অভহিত করে। র‍্যাব ও পুলির্শের সাথে অপরাধী চক্রের গুলি বিনিময়কে বর্ণনা করতে এ টার্মগুলো ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু গণমাধ্যমও এ টার্মগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর এই ধরণের কাজকে বৈধ হিসাবে উপস্থাপন করে।

ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশ জি.এম. নাহিদের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে আনে। তার মৃতদেহেই তাকে যে গুলি করে মারা হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ ছিল। নাহিদের বাবা দাবী করেন যে তার ছেলে পুলিশের হেফাজতে ছিল। পুলিশ তার মুক্তির জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা (৬,২৫০ ডলার) দাবী করেন। কিন্তু তার বাবা সামর্থ্য না থাকায় কিছু টাকা কম দিতে চেয়েছিলেন। এরপরই উধাও হয়ে যায় নাহিদ। ওই মাসের শে ষের দিকে পুলিশ একই মর্গে আরো তিনজন কিশোরের লাশ হস্তান্তর করে। পুলিশ দাবি করে ওই তিনজন একটি বাসে গ্যাস বোমা নিক্ষেপ করার চেষ্টা করলে জনতার পিটুনিতে তারা প্রাণ হারায়। কিন্তু ময়না তদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় তাদের দেহে ৫৭টি বুলেট ক্ষত রয়েছে।

২০১৪ এর এপ্রিল মাসে র‍্যাবের কিছু কর্মকর্তা নারায়নগঞ্জে সাত ব্যক্তিকে অপহরণ করার পর হত্যা করে। প্রবল জনবিক্ষোভের মুখে সরকার অভিযুক্ত র‍্যাব কর্মকর্তাদের আগাম অবসরে পাঠায় এবং সাত খুন মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে। ভারত এ মামলার প্রধান আসামী নূর হুসেনকে নভেম্বরের ১২ তারিখ বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করে। এই খুনের জন্য নুর হোসেন র‍্যাব অফিসারদেরকে ভাড়া করেন বলে অভিযোগ আছে। বছর শেষ পর্যন্ত এ মামলা বিচারাধীন ছিল।

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রথম বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে বছরের শুরুতে রাজনৈতিক সহিংসতা বেড়ে যায়। প্রায় তিন মাস দেশব্যাপী হরতাল ও অবরোধ চলাকালে একশরও বেশি লোক প্রাণ হারায়। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ও পাবলিক বাসে চোরাগুপ্তা হামলায় শতশত লোক পুঙ্গত্ব বরণ করে। সংঘর্ষের পাশাপাশি একই সময়ে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং এদের অনেককেই বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ আছে। বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীরা আরো দাবি করেন যে পুলিশ উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে তাদের পায়ে গুলি করে এবং নির্যাতন চা লায়।

রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোর ঘনঘন সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াও ছিল একটি সমস্যা। এপ্রিল মাসে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগর দুই পক্ষের কর্মীরা একটি সম্মেলনে ছবি তোলা

নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয় পড়ে। এতে স্থানীয় ছাত্রলীগের সভাপতি ছুরির আঘাতে এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়, এছাড়া আরো অন্তত দশজন আহত হয়। অগাষ্ট মাসে আওয়ামী লীগের আরেক অঙ্গসংগঠন যুবলীগের কর্মীরা চাঁদপুরে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর হামলা করে বলে অভিযোগ করা হয়। ছাত্ররা যখন তাদের স্কুলের শিক্ষকের উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছিল তখন তাদের উপর এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অন্তত ২০ জন ছাত্র আহত হয় এবং তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

খ) গুম

মানবাধিকার সংঘঠন ও গণমাধ্যমের রিপোর্টে বহু গুম এবং অপহরণের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে নির্বাচনের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের পর এই ধরণের ঘটনা বেড়ে যায়। এরমধ্যে কিছু ঘটনার সাথে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী যুক্ত বলে প্রমান পাওয়া যায়। এ ধরণের ঘটনার কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা ছিল সীমিত।

জানুয়ারির ১৪ তারিখ রংপুরে সাদা পোশাকে কিছু লোক আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে আল-আমিন কবিরকে মারধর করে। এরপর তাকে, তার স্ত্রী এবং তাদের কাজের মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। কবিরের ভাই দাবী করেন যে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বাসে আগুন দেয়ার একটি ঘটনা অনুসন্ধান করতে এসেছিল। জুলাই মাস পর্যন্ত ওই তিন জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মার্চের ১০ তারিখ সাদা পোশাকধরী কিছু লোক বিএনপির মুখপাত্র এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদকে ঢাকার একটি বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করা হয়। বিএনপি দাবি করে যে তাকে অপহরণ করা হয় এবং তার স্ত্রী আদালতে হেবিয়াস কর্পাস এ্যাকশন দাবি করে একটি রিট দায়ের করেন। প্রায় দুই মাস তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর মে মাসের শুরুর দিকে ভারতের শিলং রাজ্যের একটি হাসপাতালে রহস্যজনকভাবে তার সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর তার বিরুদ্ধে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনা হয় এবং বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

গ) নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা মানহানিকর আচরণ বা শাস্তি

সংবিধান ও আইনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন, এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং মানহানিকর আচরণ বা শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক মানিবাধিকার সংস্থা এবং মিডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে র‍্যাব এবং পুলিশসহ অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেফতার এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় শাররিক এবং মানসিক নির্যাতন ও হয়রানির আশ্রয় নেয়। রিপোর্ট অনুসারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো হুমকি, মারধর এবং বৈদ্যুতিক শক ব্যবহার করে, এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা মাঝেমধ্যে ধর্ষণ এবং যৌন হয়রানির মত অপরাধেও জড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের প্রতিবেদন অনুসারে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বছরের প্রথম সাত মাসে তিন জনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এসব কর্মকান্ডের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ঘটনা বিরল।

২০১৪ সালে একজন ব্যবসায়ীকে থানায় এনে নির্যাতনের অভিযোগে এপ্রিল মাসে সিলেটের কতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতাউর রহমান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পন করেন। তার বিরুদ্ধে আনা

অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে।

প্রচলিত আইনে একটি ধারা আছে যার আওতায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনুমতি দিতে পারেন, যা রিমান্ড নামে পরিচিত। এ সময় কোন আইনজীবীর উপস্থিতি ছাড়াই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।

নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন্দিদের এবং অন্যান্যদের ওপর যৌন নির্যাতন চালান। অক্টোবর মাসে বোয়লখালী থানার একজন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনেন এক নারী। অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য ওই মহিলার করা আরেকটি মামলার তদন্তের সময় তাকে দুইবার ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগে বলা হয়।

কারাগার এবং ডিটেনশন সেন্টারের অবস্থা

বাংলাদেশের কারাগারগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। সেগুলোতে যেমন রয়েছে বন্দিদের উপচে পড়া ভিড় তেমনি সব সুবিধা অপ্রতুল। পয়:নিষ্কাষণ ব্যবস্থাও নাজুক। এর ফলে বন্দিদের অবস্থা প্রায় সময় শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। স্থানীয় একটি স্বনামধন্য এনজিও জেল হাজতে বন্দির মৃত্যুর জন্য কারাগারগুলোর এই রুগ্ন অবস্থাকে দায়ী করেন।

ভৌত কাঠামো: কারা অধিদপ্তরের মতে, আগস্টে বন্দির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯,৭১৯ জনে অথচ বন্দি ধারণ ক্ষমতা রয়েছে মাত্র ৩৪,৬৮১ জনের। এরমধ্যে ৭৪ শতাংশ বন্দি আটক রয়েছেন বিচার শুরুর আগেই অথবা তাদের বিচার চলছে। এ ধরণের বন্দিদেরকে কারা কতৃপক্ষ প্রায় সময় দন্ডিত অপরাধীদের সাথে রেখেছে।

করাগারে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে বন্দিদেরকে ঘুমাতে হয় পালাক্রমে এবং তাদের অনেকে প্রয়োজনমত টয়েলেটে যাওয়ার সুযোগও পায়নি। মানবাধিকার সংস্থা এবং গণমাধ্যমগুলো বলছে অনেক বন্দি প্রয়োজনমত স্বাস্থসেবা এবং পানি পাননি। । কারাগারের পানির মানকে সারাদেশের পানির মানের সাথে তুলনা করা যায় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পানযোগ্য নয়।

কারাগার ভেদে, এমনকি একই কারা ভবনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সেকশনে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার মধ্যে বিস্তর তফাত লক্ষ্য করা গেছে। কতৃপক্ষ কিছু বন্দিকে উচ্চ তাপমাত্রা বিশিষ্ট কক্ষে রাখেন যেখানে যথাযথ বায়ু নিরোধক ব্যবস্থা নেই কিন্তু বন্দির সংখ্যা অত্যাধিক। আইনে শিক্ষিত এবং সামাজিকভাবে মর্যদা সম্পন্ন বন্দিদের আলাদা 'ডিভিশনাল কাস্টডি'তে রাখার জন্য বলা হয়েছে। এ ধরণের কারা কক্ষগুলোতে সুযোগসুবিধা ভাল, পরিবারের সদস্যদের দেখা করার সুযোগও বেশি এবং গৃহস্থলী কিছু পণ্য ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায়।

কারাগারে অনেক কিশোর বন্দিকে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে রাখা হয়েছে যদিও আইন অনুযায়ী তাদেরকে আলাদা রাখার নিয়ম। শিশুদেরকে প্রায় সময় করাগারে রাখা হয়েছে, সাধারণত তাদের মায়েদের সাথে; যদিও আইন ও আদালতের রায়ে শিশুদের কারাগারে রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কারা কতৃপক্ষ রুটিনমাফিক মহিলা হাজতীদেরকে পুরুষদের থেকে আলাদা রেখেছে। কিন্তু আইনে 'নিরাপদ হেফাজত'-এ থাকা মহিলাদেরকে সাধারণত যারা ধর্ষণ, পাচার অথবা গৃহস্থলীতে নির্যাতনের শিকার তাদেরকে অপরাধীদের কাছ থেকে আলাদা রাখার বিধান রয়েছে। কতৃপক্ষ প্রায় এই আলাদা সুবিধা দিতে ব্যর্থ্য হয়েছে।

প্রশাসন: যারা অহিংস অপরাধের সাথে জড়িত কতৃপক্ষ তাদের বিচারের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি, এবং বন্দিরা 'কারাগার ন্যায়পাল' এর সুবিধাও পায়নি।

স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ: রেডক্রসের ইন্টারন্যাশন্যাল কমিটি এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের সরকার করাগার পরিদর্শনের অনুমতি দেয়নি।সরকার বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে বিদেশি বন্দিদের সাথে দেখা করতে দিয়েছে। এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত সরকার নিযুক্ত কিছু কমিটি প্রতি মাসে কারাগার পরিদর্শন করে। কিন্তু তারা জনসম্মুখে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। এছাড়া জেলা বিচারকরা মাঝেমধ্যে কারাগার পরিদর্শন করেন।

ঘ) খেয়ালখুশিমত গ্রেফতার এবং বিনা বিচারে আটক

সংবিধানে খেয়ালখুশি মতো গ্রেফতার এবং বিনা বিচারে আটক রাখা নিষিদ্ধ হলেও আইন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও আটক রাখার অনুমতি দিয়েছে কতৃপক্ষকে। এ ক্ষেত্রে কো ন ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ বা গ্রেফতারী ফরোয়ানার প্রয়োজন হয় না।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দ্ধারা পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত তাৎক্ষনিক দন্ডাদেশ দেয় যেখানে প্রায় সময় বিভিন্ন মেয়াদে করাদন্ডও দেয়া হয়। এ ধরণের দ্রুতগতির বিচারের ক্ষেত্রে বিবাদী কোন আইনি প্রতিনিধির সহায়তা নিতে পারেনি।

পুলিশের ভূমিকা এবং নিরাপত্তা কৌশল

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অধীনে পুলিশ দেশের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাজায় রাখতে কাজ করে। অভিবাসন সংক্রান্ত আইন দেখভালের দায়িত্ব পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের; এবং একই মন্ত্রনালয়ের অধীনস্ত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং কোস্ট গার্ড দেশের সীমানা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অধীনে সামরিক বাহিনী দেশের বাহ্যিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। যদিও প্রয়োজন হলে বিভিন্ন ধরণের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে 'বেসামরিক কতৃপক্ষকে সহযোগতিা করার জন্য' সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। পার্ব্যত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি পর্যবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর উল্ল্যেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে।

সামরিক বাহিনীর উপর বেসমারিক কতৃপক্ষের কার্যকর নিয়ন্ত্রন রয়েছে, এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর আভ্যন্তরীন দুর্নীতি বা তাদের বিরুদ্ধে যেকোন ধরণের হয়রানির অভিযোগ তদন্ত করে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেয়ার উপায় সরকারের রয়েছে, কিন্তু সরকার এই উপায় সবসময় অবলম্বন করেনি। পুলিশের পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা, দক্ষতা এবং দ্রুত সাড়া দেয়ার প্রবণতা বাড়ানোর জন্য এবং দুর্নীতি কামানোর জন্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার এবং কমিউনিটি পুলিশ সেবা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই ধরণের উদ্যোগ গ্রহন করার পরও র‍্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী নির্বিচারে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া এবং পাল্টা হয়রানির

ভয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা থেকে বিরত থেকেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে অনীহার কারণেও বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করা সম্ভব হয়নি।

আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী সমাজে সংঘর্ষ দমন করতে ব্যর্থ্য হয়েছে (সেকশন ৬ দেখুন)

গ্রেফতারের প্রক্রিয়া এবং বন্দিদের প্রতি আচরণ

আদালতের আদেশের ভিত্তিতে পুলিশ অপরাধের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে। এছাড়া নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বিশেষ ক্ষমতাবলে বিনা ওয়ারেন্টে যেকাউকে গ্রেফতার করতে পারে। সরকার অথবা জেলা বিচারক এ প্রক্রিয়ায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সর্বোচ্চ ৩০ দিন পর্যন্ত আটক রাখার আদেশ দিতে পারে। যদিও কতৃপক্ষ কোন কোন বন্দিকে আরো বেশি সময় ধরে আটক রেখেছে। আটক ব্যক্তিকে অবশ্যই ১৫ দিনের মধ্যে তাকে আটকে রাখার কারণ সম্পর্কে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। আইন অনুসারে একটি উপদেষ্টা পরিষদ চার মাস পর সংলিষ্ট মামলা খতিয়ে দেখবে। আটক ব্যক্তি আপিল করার সুযোগ পাবে।

নিয়মিত আদালতে জামিন পাওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে। কতৃপক্ষ বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত বন্দিদেরকে আইনজীবীর সহায়তা নেয়ার সুযোগ দেয়। এমনকি সরকার মাঝেমধ্যে বন্দিদেরকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সরবারহ করে থাকে। বন্দিদের আইনি সহায়তা দেয়ার জন্য অল্প কিছু সংখ্যক প্রোগ্রাম রয়েছে কিন্তু সেগুলোর পর্যাপ্ত ফান্ড নেয়। আদালতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরর পর কতৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার আইনজীবীর সাথে দেখা করার সুযোগ দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই অভিযোগ প্রাথমিক গ্রেফতারের কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর দায়ের করা হয়ে থাকে।

নির্বিচারে গ্রেফতার: রাজনৈতিক বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নির্বিচারে গ্রেফতার করা হয় এবং সরকার গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের কোন সুনিদৃষ্ট অভিযোগ না থাকার পরও আটকে রাখে। মাঝেমধ্যে অন্য সন্দেহভাজনের ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার জন্য এই কৌশল নেয়া হয়। জানুয়ারির নির্বাচনের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে বছরের প্রথম দিকে সংঘর্ষের পর স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতারের অভিযোগ বৃদ্ধি পায়। বছরের শেষদিকে এসেও এ ধরণের গ্রেফতারের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয় নভেম্বর মাসে দুই দিনে প্রায় ১৫০০ জনকে গ্রেফতার করা হয় যার বেশির ভাগই বিরোধী দলীয় কর্মী।

বিচার-পূর্ব আটক: স্বোচ্ছাচারীভাবে বিচারের আগেই দীর্ঘকাল আটকে রাখা একটি পুরোনো সমস্যা। এর কারণগুলো হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা, সীমিত সম্পদ, বিচার পূর্ব আইনের শিথিল প্রয়োগ এবং দুর্নীতি। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশন্যাল আর্বিট্রেশন সেন্টারের মতে ২০১৪ সালে প্রায় বিশ লাখ দেওয়ানী এবং ফৌজদারি মামলা অমীমাংসিত ছিল। কিছু কিছু মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিনা বিচারে যে সময় ধরে আটকে রাখা হয়েছে তা ওই মামলার কারাদন্ডের সমান বা তার চেয়ে বেশি।

ঙ) সুষ্ঠু বিচার

আইনে স্বাধীন বিচার বিভাগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের একটি ধারা নিম্ম আদালতে বিচারক নিয়োগ এবং তাদের বেতন ভাতা ও কর্মস্থল নির্ধারণের ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের উপর অর্পন করে। এর ফলে বিচারবিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতাকে ক্ষণ্ন করা হয়েছে। কিছু বিচারক অভিযোগ করেন যে তাদের রায় ক্ষমতাশীলদের পছন্দ না হওয়ায় তাদেরকে কম গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বদলি করা হয়েছে। ২০১৪ সালে সংবিধানের ১৬তম সংশোধনীর অধীনে উচ্চ আদালতের কোন বিচারককে অভিশংসনের ক্ষমতা পায় সংসদ। কিন্তু অক্টোবর পর্যন্ত এর প্রয়োগ সংক্রান্ত কোন আইন লেখা হয়নি।

দুর্নীতি এবং জমে থাকা মামলার স্তুপ বিচার ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্থ করছে; এবং এই বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়ার

কারণে সাক্ষীকে তার মত পাল্টাতে প্ররোচিত করা হচ্ছে, ভুক্তভোগী ভীতি প্রদর্শনের শিকার হচ্ছেন এবং বিবাদী প্রমাণ হারিয়ে ফেলছেন। এর ফলে অনেক মামলার বাদী ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা বলছেন অনেক মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাটর্নী এবং আদালতের কর্মকর্তারা বাদী পক্ষের কাছে ঘোষ দাবি করেন।

বাংলাদশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবোনাল (আইসিটি) ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংগঠিত যুদ্ধাপরাধের বিচার অব্যাহত রেখেছে। এপ্রিলে ফাঁসি কার্যকর করা হয় জামায়াতে ইসলামের সিনিয়র এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল কামরুজ্জামানের। এ রায় কার্যকর যদিও বিচারিকভাবে সঠিক, বিচারের সুষ্ঠতা, স্বচ্ছতা এবং অন্যান্য সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

নভেম্বর মাসে সরকার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করে। আইসিটি তাদের দুজনকেই ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। চৌধুরীর আইনজীবীরা দাবি করেন যে তাদের মক্কেলের বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে ওই অপরাধ সংগঠিত হওয়ার সময় তিনি দেশের বাইরে ছিলেন। কিন্তু তার প্রমাণ আদালত তাদেরকে উপস্থাপন করতে দেননি।

বিচার প্রক্রিয়া

আইনে নাগরিকের ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি, পেশাজীবীদের মধ্য সক্ষমতার অভাব এবং দুর্বল সাংগঠনিক ব্যবস্থার কারণে কতৃপক্ষ সবসময় এই অধিকার নিশ্চিত ক রতে পারেনি। বিচারকদের মাসিক মূল বেতন ছিল ২৯,২০০ টাকা (৩৬৫ ডলার) থেকে ৩৯,৬০০ টাকা (৪৯৫ ডলার)। প্রজিকিউটরদের মাসিক মজুরি হচ্ছে ৩০০০ টাকা (৩৭.৫০ ডলার) এবং এর সাথে আদালতে প্রতি ঘন্টার উপস্থিতির জন্য ২০০ টাকা (২.৫০ ডলার)। এই কম বেতন কিছু আইন পেশাজীবীকে ঘুষ নিয়ে মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে অভিযোগ প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ মনে করা হয়। তাদের আপিল করার এবং একইসাথে সরকারের কাছে তাদের বিরুদ্ধে কি প্রমান আছে তা দেখার অধিকার আছে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পূর্ণাঙ্গরূপে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জানাও তাদের অধিকার। নিদৃষ্ট কিছু অপরাধের যেমন খুন, যৌন হয়রানি এবং ডাকাতি'র মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য দ্রুত বিচার আইন করা হয়েছে। কিন্তু মামলার কার্যক্রম ঘনঘন মুলতবি করায় অনেক মামলা জমে আছে। কোন জুরি ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেয়। বিচারকরা মামলা নিষ্পত্তি করেন এবং বিচার প্রক্রিয়া উম্মুক্ত। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল বিবাদীদের সরকারি আইনজীবী পাওয়ার অধিকার আছে। বিবাদীকে মামলা মোকাবেলার প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়। এছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কাউন্সিলের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রাখে। একই সাথে তারা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য উত্থাপিত দলিলাদি পর্যালোচনা করতে পারবে, সাক্ষী ডাকতে পারবে এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে এবং রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে। কিন্তু সরকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসব অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না।

রাজনৈতিক বন্দি

যদিও বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতার এবং বিচারের ক্ষেত্রে তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা একটি কারণ বলে মনে হতে পারে সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক অভিযোগে তাদের বিচার করেনি।

সিভিল কোর্টে বিচার প্রক্রিয়া এবং প্রতিকার

যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের মানবাধিকার খর্ব হলে আইনি প্রতিকার চাইতে পারে। কিন্তু সিভিল কোর্টে বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসুত্রিতা এবং জটিল প্রক্রিয়ার কারণে অনেকে অভিযোগ দায়ের করা থেকে বিরত থাকেন। সরকার সিভিল কোর্টে বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেনি। দুর্নীতি এবং বাইরের হস্তক্ষেপ ছিল সিভিল কোর্টে বিচার প্রক্রিয়ার অন্যতম সমস্যা। সিভিল কেইস নিষ্পত্তি করার জন্য অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন সিস্টেম থাকার কারণে নাগরিকরা তাদের মামলা মধ্যস্থতাকারীর কাছে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। সরকারী একটি সুত্র জানায়, সিভিল কেইস নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতার ব্যাপক ব্যবহার বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বিচার নিষ্পত্তি কতটা সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ ছিল তা মূল্যায়ন করা হয়নি।

সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ

১৯৭৪ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন অনুযায়ী সরকার ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ করে হিন্দুদের যারা তাদের ভূমি হারিয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কোন উদ্যোগ নেয়নি। (সেকশন ২.ঘ দেখুন)

সংখ্যালুঘু সম্প্রদায় দাবি করে যে অনেক জায়গায় বিশেষ করে যেখানে নতুন রাস্তা হয়েছে অথবা শিল্প অঞ্চল গড়ে উঠেছে এবং জমির দাম সম্প্রতি বেড়ে গেছে সেখানে জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধের জের ধরে তাদের সম্প্রদায়ের লোকজনকে আনুপাতিক হারে বেশি উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা আরো দাবি করে যে পুলিশ, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতারা হয়ত তাদের জমি দখলে সরাসরি জড়িত ছিল নয়ত প্রভাবশালী ভূমিদুস্যদের আইনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। (সেকশন ৬ দেখুন)

চ) গোপনীয়তা, পরিবার, বাসা, অথবা যোগাযোগ মাধ্যমে অবৈধ হস্তক্ষেপ

আইন অনুসারে ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপর খেয়ালখুশিমত হস্তক্ষেপে কো ন নিষেধাজ্ঞা নেয়; বরং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অনুমতি নিয়ে গোয়েন্দা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপর নজরদারি করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুলিশ বেশিরভাগ সময় কোন ধরণের ওয়ারেন্টের তোয়াক্কা করে না। নিয়মমাফিক এই আইন লঙ্ঘন করার জন্য কতৃপক্ষ কোন অফিসারকে বিচারের আওতায় আনেনি।মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করে যে সরকারের কথিত সমালোচকদের উপর নজরদারি এবং তাদের ব্যাপারে রিপোর্ট করার জন্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই) ইনফরমার বা তথ্যদাতা নিয়োগ করেছে। সরকার নিয়মিতভাবে বিরোধী রাজনীতিবিদদের উপর নজরদারি চালায়। মানবাধিকার সংস্থা এবং গণমাধ্যমের রিপোর্টে বলা হয় পুলিশ মাঝে মাঝে যথাযথ অনুমোদন ছাড়া বাসাবাড়িতে তল্লাশি চালায়।

সেকশন ২: ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি সম্মান, যার মধ্যে আছে:

ক) মত প্রকাশ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবিধানে মুক্ত মত প্রকাশ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার মাঝেমধ্যেই নাগরিকের এই অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। অন্যদিকে হয়রানির ভয়ে অনেক সাংবাদিক সরকারের সমালোচনা করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা: সংবিধান অনুসারে সংবিধানের সমালোচনা করা রাষ্ট্রদ্রোহের সামিল। আর রাষ্ট্রদ্রোহের সাজা তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড। কিন্তু আদালত এই আইনের আওতায় কাউকে সাজা দেয়নি। এ আইনে ঘৃণামূলক বক্তব্য সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যদিও ঘৃণামূলক বক্তব্য বা হেট স্পীচ বলতে কী বোঝায় তা যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এর ফলে সরকারকে এই আইনের বিস্তৃত এবং নানামুখী ব্যখ্যার ক্ষমতা পেয়েছে। কোন বক্তব্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বন্ধু রাষ্ট্র এবং জন শৃঙ্খলার

স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে, ভদ্রতা ও নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করলে, আদালত অবমাননা এবং মানহানিকর হলে, অথবা সংঘর্স উস্কে দিতে পারে এমন মনে হলে সরকার তা নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

অক্টোবর মাসের একটি রিপোর্টে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা এবং স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক সংসদকে 'পুতুল নাচের মঞ্চ' বলে অভিহিত করেন এবং একে কার্যকর করার জন্য সবার অংশ গ্রহনমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন দেয়ার প্রস্তাব করেন। এর প্রতিউত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে টিআইবিকে এই বলে সতর্ক করা হয় যে প্রতিষ্ঠানটির অর্থের উৎস অনুসন্ধান করা হবে, এটির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহের অভিযোগ আনা হবে এবং নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশ করা হবে। এছাড়া আরো বলা হয় যে এনজিও কতৃক রাষ্ট্র বা সংসদের অপমান করা ঠেকাতে সংসদরা নতুন একটি আইন প্রণয়নের কথা ভাবছেন।

<u>সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা:</u>

স্বাধীন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল স্বক্রিয় এবং তারা বিভিন্ন ধরণের মতামত প্রকাশ করেছে। যদিও যে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সমালোচনা করেছে সেগুলো সরকারের নেতিবাচক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। স্বাধীনচেতা সংবাদকর্মীরা অভিযোগ করেন যে কিছু পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়ে এবং বেসকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ওই পত্রিকায়গুলোতে বিজ্ঞাপন না দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সংবাদ মাধ্যমকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। মোবাইল ফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীন ফোনের পক্ষ থেকে মিডিয়াকে বলা হয়েছে যে কতৃপক্ষ তাদেরকে এবং অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে "দুটি শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায়" বিজ্ঞাপন না দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।

সরকারের একটি রেডিও স্টেশন এবং একটি টেলিভিশন স্টেশনে আছে। আইন অনুসারে দেশের একমাত্র টেরিসট্রিয়াল (নন-স্যাটলাইট) সম্প্রসার মাধ্যম থাকবে বাংলাদেশ পাবলিক টেলিভিশন স্টেশন (বিটিভি)। আনুমানিক প্রায় ৬০ শতাংশ জনগণের প্রাইভেট স্যাটলাইট চ্যানেলে একসেস নেই এবং পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় যে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ সংবাদের জন্য টিভি'র উপর নির্ভরশীল।বিটিভি পার্লামেন্টের অধিবেশন এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্প্রচার করে; এবং সরকার বিরোধী কোন মত প্রকাশ করেনা বললেই চলে। সরকার কেবল অপারেটরদের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করেনি। সরকারের নির্দেশে সব বেসরকারি চ্যানেলকে কোন ধরণের ফি ছাড়াই বিটিভির নির্বাচিত কিছু সংবাদ প্রোগ্রাম এবং প্রধনামন্ত্রীর বক্তব্য সম্প্রচার করতে হয়।

<u>সহিংস আচরণ এবং হয়রানি:</u> মাঝেমধ্যে কতৃপক্ষ এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সাংবাদিকদের শাররীকভাবে আক্রমন ও হয়রানি করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে। জানুয়ারি মাসে বিএনপির নির্বাসিত ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৫০ মিনিটেরে একটি বক্তৃতা সম্প্রচার করায় পুলিশ একুশে টিভির চেয়ারম্যান আব্দুস সালামকে গ্রেফতার করে। যদিও প্রাথমিকভাবে ফর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রন আইনের আওতায় অভিযোগ আনা হয়েছিল পরবর্তীতে পুলিশ তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করে।

ওই বছর সহিংস উগ্রপন্থীরা চার জন সেকুলার ব্লগারকে খুন করে যারা ইসলাম বিরোধী লেখালেখির জন্য পরিচিত ছিল। এই হত্যাকান্ডগুলো অনুসন্ধান এবং এর সাথে জড়িতদের ধরার জন্য সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এসব হত্যাকান্ডের নিন্দা জানানো হয়েছে কিন্তু একইসাথে সতর্কও করা হয়েছে যে কারো এমন কিছু লেখা উচিত হবে না যা অন্যের ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানতে পারে। ধর্মানুভূতিতে আঘাত করা একটি অপরাধ।

অক্টোবর মাসে উগ্রপন্থীরা প্রায় একই সময়ে দুটি জায়গায় নিহত ব্লগার অভিজিত রায়ের প্রকাশকদের উপর হামলা চালায়। এতে একজন নিহত হয় এবং তিনজন আহত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে আল কায়েদার শাখা একিউআইএস এর পক্ষ থেকে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো এই হামলার দায় স্বীকার করে।

<u>সেন্সরশীপ অথবা বিষয়বস্তুর উপর বিধিনিষেধ:</u> সরকার হুমকি এবং হয়রানির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের উপর সেন্সরশীপ আরোপ করতে চেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তারা বেসরকরি টেলিভিশন চ্যানেলকে বিরোধী দলের কর্মসূচি অথবা বিবৃতি ছাপতে নিষেধ করেছে। সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করায় বহুল প্রচারিত পত্রিকা প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারকে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়নি।

কিছু সাংবাদিক এবং মানবাধিকার সংস্থার মতে, বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভয়ে সাংবাদিকরা

সেলফ সেন্সরশীপ (নিজেরাই নিজেদের উপর সেন্সরশীপ) আরোপ করেন। যদিও সচরাচর সরকারের প্রকাশ্যে এবং জোরালো সমালোচনা লক্ষ্য করা গেছে, কিছু সাংবাধিক নেতা সরকারের পক্ষ থে কে হয়রানির আশংকা প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকারও তার পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের মত দলীয় সর্মর্থকদের নতুন সম্প্রচার লাইসেন্স দিয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এ লাইসেন্স দেয়া থেকে বিরত থেকেছে।

বিদেশি প্রকাশনা এবং সিনেমার উপর সরকার কোন ধরণের কঠোর নিয়ন্ত্রন কিংবা সেন্সর আরোপ করেনি। কিন্তু বাংলাদেশে দায়িত্বরত কোন কোন বিদেশি সংবাদ প্রতিনিধি দাবি করেন যে সেলফ সেন্সরশীপ আরোপে তাদের উপর চাপ ছিল।

সরকার স্থানীয় ও বিদেশি চলচিত্র পর্যালোচনার জন্য একটি ফিল্ম সেন্সরশীপ বোর্ড গঠন করে। এই বোর্ড রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুভূতি এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষার স্বার্থে, এবং অশ্লীলতা, মানহানি এবং জালিয়াতি রোধ করার জন্য চলচিত্র সেন্সর বা নিষিদ্ধ করার অধিকার রাখে। কিন্তু আগের চেয়ে এক্ষেত্রে কড়াকড়ি অনেকটা কমেছে।

ভিডিও রেন্টাল লাইব্রেরি এবং ডিভিডি শপ এ বিস্তৃত ধরণের সিনেমার সংগ্রহ আছে এবং সরকার বিক্ষিপ্তভাবে এগুলোর উপর সেন্সরশীপ আরোপ করতে চেয়েছে কিন্তু তা ছিল অকার্যকর।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা নিয়ে নির্মিত একটি সিনেমার প্রদর্শনের উপর আদালতের স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সেপ্টম্বর মাসে খারিজ করে দেয়, কিন্তু চলচিত্র উন্নয়ন বোর্ডে করা নতুন একটি আপিলের কারণে এই সিনেমার ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

সরকার মাঝেমধ্যে জাতীয় নেতাদেরকে নিয়ে বানানো অশালীন ছবি এবং আপত্তিকর মন্তব্য সেন্সর করেছে।

জাতীয় নিরাপত্তা: ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার “উগ্রপন্থীরা আবার তাদের কুৎসিত রূপে বেরিয়ে আসছে” শিরোনামে একটি প্রচারণামূলক পোস্টোরের ছবি প্রকাশ করে। এর পর জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন যে “নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের পৃষ্টপোষকতা করায়” সরকার ডেইলি স্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে।

সরকারের বাইরের শক্তির প্রভাব: অক্টোবর মাসে আল-কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সব কন্টিনেন্ট বা একিউআইএসের কথিত সহযোগীরা বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠায়। এতে বলা হয় নারী সাংবাদিক নিয়োগ দিয়ে এবং বেপর্দায় নারীদের প্রদর্শন করে তারা ইসলামের অবমাননা করছে এবং শরিয়া আইন লঙ্গন করছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারে স্বাধীনতা

সরকার ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করেছে এবং অনলাইনের বিষয়বস্তু সেন্সর করা হয়েছে। শুধু তা নয়, বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট অনুসারে সরকার অনলাইনে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপরও নজরদারি করেছে। মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলোর রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে ১.৫ মিলিয়ন ইন্টারনেট গ্রাহক আছে এবং এছাড়া আরো ৪১.৩ মিলিয়ন মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে। ইন্টারন্যাশন্যাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের মতে ২০১৩ সালে দেশের ৬.৫ শতাংশ লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা দলগতভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করে কিন্তু কিছু অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট বলেন যে তারা তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি আইনের আওতায় বিচারের ভয়ে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছেন। অনলাইনে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করার জন্য সরকার আইসিটিএ এবং রষ্ট্রদ্রোহ আইনে (যার সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদন্ড) মামলা করার হুমকি দিয়েছে। জাতীয় ঐক্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য ক্ষতিকর মনে হয় এমন বিষয়বস্তু বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে নিয়েছে অথবা প্রকাশ করতে দেয়নি। সরকার কিছু ফেইসবুক পেইজও ব্লক করেছে যেখানে মহানবীকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার সমালোচনা করা হয়েছে।

টেলিফোনে বার্তা প্রেরণের মাধ্যম ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কস (ভিপিএন) এবং ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল (ভিওআইপি) ছিল অবৈধ কিন্তু সচরাচর এই আইন ব্যক্তি পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়নি। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয় যে যদিও সরকার নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে ফেইসবুক বন্ধ করে দেয়, সরকারের কিছু কিছু বিভাগ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের পেইজ ঠিকই নিয়মিত আপডেট করেছে।

২০১৩ সালে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে আইসিটিএ আইনে সাইবার অপরাধের শাস্তি বাড়ানো হয়েছে, আরো বেশি অপরাধ জামিন অযোগ্য করা হয়েছে, এবং আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে আদালতের আদেশ ছাড়াই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই আইনের বিরোধীতাকারীরা দাবি করেন যে ৫৭ ধারার আওতায় রাষ্ট্র বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনলাইনে উত্তেজনাকর এবং মানহানিকর তথ্য দেয়াকে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত করার মধ্যমে বাক স্বাধীনতা রুদ্ধ করা হয়েছে। ৫৭ ধারার সাংবিধানিক ভিত্তি নিয়ে করা একটি আবেদন উচ্চ আদালত সেপ্টেম্বর মাসে খারিজ করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী এবং তার ছেলেকে নিয়ে উপহাস করে ফেইসবুকে ছবি দেয়ার অভিযোগে পুলিশ জানুয়ারি মাসে ফিরদাতুল মুনতাহা সানজিদা নামে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফেইসবুকে একটি কার্টুন আপলোড করার অভিযোগ পুলিশ মে মাসে রোমান পালোয়ান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং তার বিরুদ্ধে আইসিটিএ আইনের আওতায় মামলা করে।

একাডেমিক স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

সরকার একাডেমিক স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির উপর অল্প কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় যে স্পর্শকাতর ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়বস্তু যা ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উস্কে দিতে পারে এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা না করতে বলা হয়েছে। এমনকি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোন ধরণের প্রকাশনার আগে তা যাছাই করে দেখা হয়েছে এবং সরকারের অনুমোদন নিতে হয়েছে।

খ) শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা

সংবিধানে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। সরকার সাধারণত এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রতিবাদ, অসন্তোষের সময় মুক্তভাবে সমাবেশ সীমাবদ্ধ করেছে সরকার। বিশেষকরে ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের বর্ষপূর্তিকে ঘিরে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অস্থিরতার সময় এ ধরণের বিধি নিষেধ বেশি আরোপ করা হয়েছে।

সমাবেশ করার অধিকার

সরকার জনসভা করার অনুমতি দিয়েছে কিন্তু কিছু কিছু সময় রাজনৈতিক সমাবেশ এবং বিক্ষোভ করায় বাধা দিয়েছে। আইন অনুসারে সরকার চারজনের বেশি লোক সমাগম নিষিদ্ধ করতে পারে। ঢাকা মহানগরের পুলিশের আদেশ অনুসারে সমাবেশ, প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজনের আগে অনুমতি নিতে হবে।

মানবাধিকার রক্ষায় সোচ্চার এমন এনজিওগুলোর মতে, কতৃপক্ষ এই আইন আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করেছে। বিশেষ করে সংসদ নির্বাচনের বর্ষপূর্তিকে ঘিরে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় এ আইনের অতিরিক্ত প্রয়োগ দেখা যায়। প্রায় সময় পুলিশ এবং ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা যৌথভাবে বিরোধী দলের প্রতিবাদ সভা ভঙ্গ করে দেয়।

নির্বাচনের বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে যখন ব্যাপক হারে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে তখন মার্চে কতৃপক্ষ জাতীয়

ক্রিকেট দলের বিজয় উদযাপনের জন্য আওয়ামী লীগকে র‍্যালী কারা অনুমতি দেয়। কিন্তু একই ধরণের কর্মসূচি বিএনপি করার অনুমতি চাইলে সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। সেপ্টম্বর মাসে ছাত্ররা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির উপর ভ্যাট আরোপ করার প্রতিবাদে ঢাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। পুলিশের সংযত প্রতিক্রিয়ার কারণে আন্দোলন বেগবান হয় এবং শেষ পর্যন্ত সরকার ভ্যাট প্রত্যাহার করে নেয়।

সংগঠন করার অধিকার

আইনে জনগণের সংগঠন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু নৈতিকতা এবং জন শৃঙ্খলার স্বার্থে সংগঠন করার ক্ষেত্রে 'যুক্তিসংঙ্গত বিধি নিষেধ' আরোপ করার জন্য বলা হয়েছে। সরকার সাধারণত এই অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো যে এনজিওগুলো স্পর্শকাতর কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করে যেমন মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, অধিবাসিদের অধিকার এবং রোহিঙ্গা শরনার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান সেগুলোর বৈদেশিক অর্থায়ন মাঝেমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে (সেকশন ২.ঘ, ৫, এবং ৭.ক দেখুন)।

বিদেশী অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামুলক কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রন আইন নামে বিবেচনাধীন একটি খসড়া আইন নিয়ে গণমাধ্যম ছিল সরব। সংশ্লিষ্ট অনেক বিদেশী কর্মকর্তাও এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। এই আইন পাস হলে এনজিওগুলোর নিবন্ধনের বৈধতার মেয়াদ বাড়বে কিন্তু এনজিও এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বৈদেশিক অনুদান গ্রহনের উপর আরো কিছু বিধি নিষেধ যোগ হবে। এই আইন অনুসারে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন নিতে হবে এবং এই ব্যুরো প্রকল্পগুলো পর্যবেক্ষণ করবে। এছাড়া ব্যুরো মহাপরিচালককে নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ বৈদেশিক অনুদানের তিনগুন পর্যন্ত জরিমানা করা এবং কোন এনজিও বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

গ) ধর্মীয় স্বাধীনতা

স্টেট ডিপার্টমেন্টের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখুন এই লিংকে: www.state.gov/religiousfreedomreport/.

ঘ) চলাফেরার স্বাধীনতা, আভ্যন্তরীনভাবে বাস্তচ্যুত মানুষ, শরনার্থী সুরক্ষা, এবং রাষ্ট্র পরিচয়হীন ব্যক্তি

আইন দেশের মধ্য চলাফেরার স্বাধীনতা, বিদেশীদের ভ্রমন, দেশান্তর এবং প্রত্যাবাসনের স্বাধীনতা দিয়েছে। এবং দুটি জায়গা - পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার - ছাড়া সরকার সাধারণত এই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশীদের ভ্রমণের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে কিন্তু তা কিভাবে কার্যকর করবে সে ব্যাপারে আগস্ট মাস পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জাতিসংঘের শরনার্থী বিষয়ক হাই কমিশন (ইউএনএইচসিআর) এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা যেগুলো উদ্বাস্তু, শরনার্থী, রাষ্ট্র পরিচয়হীন ব্যক্তি এবং অন্যান্য অরক্ষিত গোষ্ঠীকে নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদান করে সরকার তাদেরকে পুরাপুরি সহযোগিতা করেনি। উদাহরণস্বরূপ, সরকার ইউএনএইচসিআরকে সকল অরক্ষিত গোষ্ঠীর নিকট প্রবেশাধিকার দেয়নি বিশেষ করে অনিবন্ধিত রোহিঙ্গারা যারা কক্সবাজারে অবস্থিত দুটি শরণার্থী ক্যাম্পের বাইরে বিভিন্ন গ্রামে অথবা শহরে অবস্থান করছে।

বিদেশ ভ্রমন: বিরোধী রাজনৈতিক দলের কিছু সিনিয়র নেতা অভিযোগ করেন যে তাদের পাসপোর্ট নবায়ন করতে অস্বাভাবিক রকমের বেশি সময় লেগেছে, এবং অন্য অনেকে বলেন যে তারা বিদেশে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে ছাড় পেতে দেরি অথবা অন্যান্য হয়রানির শিকার হয়েছেন। ১৯৭১ সালের সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের উপর বিদেশ ভ্রমনের নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত ছিল।
ইসরায়েলে ভ্রমনের জন্য এই দেশের পাসপোর্ট বৈধ নয়।

আভ্যন্তরীনভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৩-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের সশস্ত্র সংঘাতের ফলে হাজার হাজার আদিবাসী বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। সংঘর্ষের সময় সরকার সমভূমি থেকে ভূমিহীন বাঙ্গালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করে যাতে পার্বত্য এলাকায় বাঙ্গালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ইন্টারনালী ডিসপ্লেইসড পার্সনস (আইডিপি) বা আভ্যন্তরীনভাবে বাস্তুচ্যুতদের সীমিত শাররিক নিরাপত্তা ছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতারা দাবি করেন যে বাঙালি সেটলাররা ব্যাপকহারে আদিবাসীদের অধিকার লঙ্ঘন করেছে। মাঝেমধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সেটলারদের সহায়তা করেছে।

পার্বত্য অঞ্চলে বাস্তুচ্যুতরা আদালত এবং আইনের সহায়তা পায়নি। দেশি এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন (সিএইচটি কমিশন) পার্বত্য অঞ্চলে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে। এই কমিশনের মতে পর্যাপ্ত তথ্য এবং বাস্তুচ্যুতদের সহায়তার জন্য আইনজীবীর অভাবের কারণে তাদের বিচার পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কমিশনের প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে ভুয়া নাম ব্যবহারের মাধ্যমে, ভীতি প্রদর্শন ও জোর প্রয়োগ করে, এবং জালিয়াতি ও সরকারের জমি অধিগ্রহনের সুযোগ নিয়ে সেটলাররা আদিবাসীদের জমি দখল করে নিয়েছে (সেকশন ৬ দেখুন)।

পার্বত্য এলাকায় বাস্তুচ্যুতদের মোট সংখ্যা কত তা নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়নি। ২০০০ সালে সরকারের একটি টাস্ক ফোর্স অনুমান করে যে আদিবাসী এবং অনাদিবাসী মিলে মোট বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ৫০০,০০০।কিন্তু সিএইচটি কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে আদিবাসী বাস্তুচ্যুতদের সংখ্যা ৯০,০০০ এর কিছু বেশি।

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তুচ্যুতদের পুর্নবাসনের জন্য ওই অঞ্চলে ভূমি নিয়ে যে বিরোধ রয়েছে তা সামাধান করা হবে এবং অবশিষ্ট সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। কিন্তু সেটলারেদের বাস্তুচ্যুত হিসাবে চিহ্নিত করা নিয়ে বিতর্কের কারণে বাস্তুচ্যুতদের জন্য যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে তা কাজ করতে পারেনি। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে কতৃপক্ষ একটি বর্ডার গার্ড ক্যাম্প স্থাপন এবং সেনাবাহিনীর জন্য একটি বিনোদনমূলক সুবিধা তৈরির জন্য কতিপয় আদিবাসী পরিবারকে তাদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছে। ওই বছর ভূমি নিয়ে বিরোধের কোন সমস্যার সামাধান হয়নি।

শরনার্থীদের নিরাপত্তা

বার্মা থেকে আসা ৩২,০০০ নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরনার্থীকে সরকার এবং ইউএনএইচসিআর কুতুপালং এবং নয়াপাড়া নামক দুটি অনুমোদিত শরনার্থী ক্যাম্পে সাময়িক নিরাপত্তা এবং মৌলিক সুবিধা প্রদান করে

থাকে। সরকার এবং ইউএনএইচসিআর এর হিসাব অনুযায়ী অনুমানিক আরো দুই থেকে পাঁচ লাখ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাইরে বিভিন্ন গ্রাম এবং শহরে বাস করছে। অধিকাংশ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং উখিয়া উপজেলার স্থানীয় লোকজনের মাঝে বিভিন্ন অনুমোদনহীন ক্যাম্পে বাস করে। এর মধ্যে কুতুপালং ক্যাম্পের পাশে স্থাপিত অস্থায়ী কুতুপালং শিবিরে ৪২,০০০ হাজার, লেদা নামক একটি শিবিরে ১৫,০০০ এবং শ্যামলাপুর শিবিরে ৯,০০০ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা রয়েছে।

সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। এই কৌশলপত্রের মূল ছয়টি উপাদান হচ্ছে: সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা হুমকি মোকাবেলা, মানবিক সহায়তা প্রদান, বার্মার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, রোহিঙ্গা সমস্যার আভ্যন্তরীন সমন্বয়, এবং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের জরিপ করা।

সময়েসময়ে বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগরে মাইগ্রেশন সমস্যা দ্বারা উভয় রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশিরা আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে এমন ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে সরকার নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য কাজ করেছে।

<u>আশ্রয় লাভের অধিকার:</u> আইনে কাউকে এসাইলাম অথবা শরণার্থী স্ট্যাটাস দেয়ার বিধান নেয়। এবং শরণার্থী সুরক্ষার জন্য সরকার আনুষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেনি। বার্মা থেকে আসা রোহি ঙ্গা শরণার্থী যারা এরই মধ্যে এ দেশে বসবাস করছে সরকার তাদের কিছু সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের, যাদেরকে সরকার অবৈধ অর্থনৈতিক অভিবাসী বলে অবহিত করে, তাদের কোন ধরণের আশ্রয় দিতে কতৃপক্ষ অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যে সমস্ত রোহিঙ্গারা নিবন্ধিত এবং দুটি অনু মদিত ক্যাম্পে থাকছে তাদেরকে সাময়িক সুরক্ষা এবং মৌলিক সহায়তা দেয়ার জন্য সরকার ইউএনএইচসিআরকে সহযোগিতা করেছে। যদিও উল্ল্যেথযোগ্য পরিমান সুরক্ষা সমস্যার কোন সমাধান হয়নি, জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করার ফলে অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা এবং সুমদ্রে মাইগ্রে শন সংকটের শিকার নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের বিশেষ সহায়তা প্রদানে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে।

<u>রিফাউলমেন্ট (জোরপূর্বক স্বদেশে ফেরত পাঠানো):</u> বার্মায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর চলমান দমন নিপিড়ন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে তারা নিরাপদে এবং স্বেচ্ছায় তাদের দেশে ফিরতে পারছে না। ইউএনএইচসিআর এর মতে জানুয়ারি এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ কতৃপক্ষ আনুমানিক ৪,৭১৯ জন রোহিঙ্গাকে জোরপূর্বক বার্মায় ফেরত পাঠিয়েছে। ২০১৪ সালে মোট ৫,৫২১ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ইউএনএইচসিআর, যার উভয় দেশেই মাঠ পর্যায়ে উপস্থিতি রয়েছে, এর মতে ফেরত পাঠানো অনেকেই সম্ভবত শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় এবং সুরক্ষা পাওয়ার যৌক্তিক দাবি রাখে। এই বিতাড়ন সত্বেও দুদেশের সীমানা ছিল অরক্ষিত। ইউএনএইচসিআর উল্ল্যেখ করে যে ব্যবসা-বাণিজ্য, চোরাচালান এবং অবৈধ অভিবাসনের জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে অনুপ্রবেশর ঘটনা ছিল নিত্যনৈমত্তিক।

<u>শরণার্থী নির্যাতন:</u> ইউএনএইচসিআর এর প্রতিবেদনে শরণার্থী নির্যাতনের বিভিন্ন ধরণের ঘটনা উল্ল্যেখ করা হয় যার মধ্যে ধর্ষণ, হামলা, গৃহস্থলিকাজে নিয়োজিতদের নির্যাতন, খেতে না দেয়া, নির্বিচারে আটক এবং তালিকাভূক্তকরণে হয়রানি উল্ল্যেখযোগ্য।

<u>চাকরি:</u> সরকার রোহিঙ্গাদের চাকরি অথবা স্থানীয়ভাবে কোনধরণের কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দেয়নি। শরণার্থী শিবিরের বাইরে তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল সীমিত এবং যেকোন কাজে ক্যাম্পের

বাইরে যাওয়ার জন্য তাদের অনুমতি নিতে হয়। এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও কিছু শরণার্থী অবৈধভাবে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করেছে যেমন রিকশাচালক এবং দিনমজুর হিসাবে। অনিবন্ধিত রোহিঙ্গারাও অবৈধভাবে কাজ করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিনমজুর হিসাবে।

মৌলিক সেবা প্রাপ্তি: ইউএনএইচসিআর এর সাথে যৌথভাবে কাজ করে সরকার অনুমোদিত শরণার্থী শিবিরের কিছু সেবা যেমন স্যানিটেশন, পুষ্টি এবং আশ্রয় ব্যবস্থার মানের উন্নতি করেছে। এই সেবাগুলোর মান সম্প্রতি নূন্যতম আন্তর্জাতিক মানের নিচে চলে এসেছিল। কিছু মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হয়নি। জনাকীর্ণ রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব শহর এলাকার বস্তির সমান। ইউএনএইচসিআর এবং বিশ্বব্যাংকের খাদ্য কর্মসূচির ২০১৪ সালের একটি জরিপে বলা হয় যে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে শিশুর অপুষ্টি (বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা এবং কম ওজনজনিত সমস্যা) সারাদেশের তুলনায় বেশি যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরী অবস্থার মাপকাটি অতিক্রম করেছে।

২০১০ সালে সার্বজনীন শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয় কিন্তু শরণার্থী শিবিরে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ ছিল, যদিও আগের বছর এ সুযোগ ছিল পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। সরকারি কতৃপক্ষ শরণার্থীদেরকে ক্যাম্পের বাইরে স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেয়নি, যদিও কিছু শরণার্থী বাইরের স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

সরকারি কতৃপক্ষ নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বৈধভাবে এবং নিয়মিতভাবে চিকিৎসা নেয়ার সুযোগ দেয়নি। বরং ইউএনএইচসিআর এবং কিছু এনজিও অনুমোদিত ক্যাম্প দুটিতে নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। অন্যদিকে মাইগ্রেশনের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন আইওএম অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোতে বসবাসকারী অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবা দেয়। ক্যাম্পের বাইরে থেকে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের এবং স্থানীয় জনগণকে মানবিক সহায়তা প্রদান করছিল এমন কিছু এনজিওর কার্যক্রম সরকার সীমিত করে দেয়। তাদেরকে ক্যাম্পের বাইরে কাজ করতে দেয়া হয়নি। এর ফলে অনিবন্ধিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা এবং অন্যান্য সেবা লাভের পথ সংকোচিত হয়ে পড়ে।

প্রকল্প অনুমোদনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। ২০১৪ সালে সরকারের সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্তির পর আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আন্তর্জা তিক এনজিওগুলো নিবন্ধিত এবং অল্প কিছু সংখ্যক অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের মৌলিক কিছু সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে পেরেছে যার মধ্যে রয়েছে পানি স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষা।

নিবন্ধিত শরণার্থীদের আনুষ্ঠানিক আইনি সেবা প্রাপ্তির কোন উপায় ছিল না। যদিও তারা তাদে র অভিযোগ ক্যাম্পে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের নিকট পেশ করতে পারত এবং তারা বিরোধ মীমাংস করত। অনিবন্ধিত জনগোষ্ঠীর কোন আইনি সুরক্ষা ছিল না এবং তাদেরকে প্রায় সময় গ্রেফতার করা হত কারণ সরকারের চোখে তারা অবৈধ অর্থনৈতিক অভিবাসী।

রাষ্ট্র পরিচয়হীন মনুষ

বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা আইনত রাষ্ট্রপরিচয়হীন। তারা কোনভাবেই এ দেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার রাখে না, হোক জন্মগতভাবে অথবা স্থানীয় নাগরিকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে।

সেকশন ৩. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের স্বাধীনতা

সংবিধান নাগরিককে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের সরকার নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে নির্বাচন নিদৃষ্ট সময় অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি হবে সার্বজনীন এবং সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কিন্তু ভোটে কারচুপি এবং বিরোধী দলের বর্জনের কারণে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনগুলো ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

নির্বাচন এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহন

সাম্প্রতিক নির্বাচন: ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচন প্রধান বিরোধী দল বর্জন করায় অর্ধেকেরও বেশি আসনে কোন প্রতিদন্দিতা হয়নি এবং আরো অনেক আসনে শুধু নামেমাত্র প্রতিদন্দিতা হয়েছে। যেহেতু নির্বাচনে অল্প কিছু সংখ্যক প্রার্থী ছিল অনেক ভোটার তাদের পছন্দের প্রার্থী নির্বাচনের সুযোগ পায়নি। নির্বাচনের পূর্বে কয়েকমাস রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সহিংসতা লেগে ছিল। স্বাধীন নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা ভোট কেন্দ্রে এবং কেন্দ্রের আশেপাশে সংঘর্ষ, কেন্দ্রে যেতে ভোটারদের বাঁধা এবং জোরপূর্বক ভোট দেয়ার মত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৩৫টিতে জয় লাভ করে ক্ষমতায় বহাল থাকে। নির্বাচন বর্জন করায় নবগঠিত সংসদে বিএনপির কোন আসন নেয়। আনুষ্ঠানিক বিরোধী দল জাতীয় পার্টি নির্বাচনে ৩৬ আসনে জয় লাভ করে এবং এটি ছিল ক্ষমতাসীন জোটেরই একটি অংশ। অবশিষ্ট আসনগুলোর অধিকাংশতেই যে দলগুলো আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছে তারাই জয়ী হয়েছে। শেখ হাসিনার মন্ত্রী সভায় তার জোটের অন্যান্য দলগুলোরও প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

একাধিক সূত্রের মতে এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়া ঢাকা ও চট্টগ্রামের পৌর নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি, ভীতি প্রদর্শন এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। অনিয়মের প্রতিবাদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা ভোট গ্রহন শুরুর তিন ঘন্টার মধ্যেই তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে। অনিয়ম এবং অসদ উপায় অবলম্বনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশ ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুফ নামে নির্দলীয় নাগরিক সমাজের একটি নেটওয়ার্ক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে অবহিত করে।
ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগের কয়েক মাসজুড়ে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচন ছিল সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ। পর্যবেক্ষরা আনুমানিক ৮-১০ শতাংশ কেন্দ্রে জালিয়াতি হয়েছে বলে মত দেন। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সহিংসতার কিছু ঘটনা ঘটে কিন্তু নিয়মিত ভোটাররা সহিংসতার শিকার হয়নি।

রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহন: ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে সংঘটিত সাধারণ নির্বাচন বিএনপি বর্জন করায় নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি ছিল কম। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৪৭ আসনে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে সেখানে ভোটারের উপস্থিতি ছিল ৪০ শতাংশ। যেখানে ২০০৯ সালে

৮০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছে। অন্যদিকে ১৫৩টি আসনে যেখানে কেবলমাত্র একজন প্রার্থী ছিল সেখানে কোন ভোট গ্রহন হয়নি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার বিরোধী দলের জনসভা করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্প্রচারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। সুপ্রীম কোর্ট ২০১২ সালের একটি রায়ে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করে এবং এ রায়ের বিরুদ্ধে দলটির করা একটি আপিল প্রক্রিয়াধীন ছিল।

নারী এবং সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহন: সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদীয় আসন সংরক্ষিত রাখার কোন বিধান নেই।

সেকশন ৪. দুর্নীতি এবং সরকারের স্বচ্ছতার অভাব

সরকারি কর্মকর্তারা দুর্নীতি করলে আইনে তাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য বলা হয়েছে; কিন্তু সরকার এই আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করেনি। কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মানবাধিকার সংস্থা, গণমাধ্যম, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সরকারের দুর্নীতির ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে।

দুর্নীতি: বিশ্ব ব্যাংকের একটি প্রতিবেদন অনুসারে সরকার দুদকের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা খর্ব করেছে এবং দুর্নীতির বিচার প্রক্রিয়ায় বাঁধা দিয়েছে। সরকার তার পূর্ববর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তুলনায় অনেক কম দুর্নীতির মামলা দায়ের করেছে এবং হাজার হাজার দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার করার জন্য দুদককে সুপারিশ করেছে সরকারী একটি কমিশন।

জাতিসংঘ কনভেনশন দুর্নীতিবিরোধী সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশন এর একটি রিপোর্ট উদৃত করে টিআইবি বলছে সরকার ২০১১ সালে দুদককে ১০,৫৩৬টি মামলা প্রত্যাহার করার জন্য আদেশ দেয়। সংবিধানের ১৬তম সংশোধনী সংসদের অভিশংসন ক্ষমতা বিস্তৃত করে অন্তর্ভূক্ত করেছে দুদক, নির্বাচন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক কমিশনকে। কিছু নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি অভিযোগ করেন যে সরকার দুর্নীতি মোকাবেলায় যথেষ্ঠ কঠোর না এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলার কাজে দুদককে ব্যবহার করা হচ্ছে। টিআইবি জোর দিয়ে বলছে যে দুদকের কার্যক্রমে সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে এটি "নখ-দন্তহীন বাঘে" পরিণত হয়েছে। দুদকের আইনে ২০১৩ সালের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে সরকারের আগাম অনুমতি ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সংস্থাটির মামলা করার ক্ষমতা বাতিল করা হয়েছে।

সরকার পুলিশের ব্যাপক দুর্নীতি ঠেকাতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। দুর্নীতি মোকাবিলায় এবং একটি দক্ষ পুলিশ বাহিনী গঠনে পুলিশের মহাপরিদর্শক পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া অব্যাহত রেখেছেন। তবে পুলিশ বাহিনীর ভেতরে দুর্নীতির ওপর এসব প্রশিক্ষণের প্রভাব নিয়ে কোন পর্যালোচনা পাওয়া যায়নি।

গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের মতে, নির্বাচনের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে সহিংসতা পুলিশকে আরো বেশি দুর্নীতিপরায়ন হয়ে উঠতে সহায়তা করে। পুলিশের একজন উপপরিদর্শক জানুয়ারির ১২ তারিখ ফায়েজ আলী নামে একজন ব্যবসায়ীর কোমরে গুলি করে। ওই পুলিশ কর্মকর্তা দাবি করেন যে রাজনৈতিক সংঘাতের সময় গুলির ঘটনা ঘটে। কিন্তু আলীর স্ত্রীর দাবি হচ্ছে তার স্বামী এক লক্ষের ও বেশি টাকা নিয়ে নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি এবং অন্যান্য বিল পরিশোধ করতে যাওয়ার পথে ওই কর্মকর্তা তার কাছে টাকাগুলো দাবি করেন। আলী তা দিতে অস্বীকৃতি জানানো য় তাকে গুলি করা হয়।
সরকার বিচার বিভাগের উপর রাজনৈতিক চাপ অব্যাহত রেখেছে (সেকশন ১.ঙ. দেখুন), এবং বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে করা মামলার বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ছিল অনিয়মিত। বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি অব্যাহতভাবে একটি মারাত্মক সমস্যা। বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসুত্রিতার পেছনে এটা একটা কারণ। এই দীর্ঘসুত্রিতা সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রভাবিত করা এবং ভুক্তভোগীদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়। মানবাধিকার সংস্থা ও দুর্নীতি পর্যবেক্ষক গ্রুপগুলোর রিপোর্টে বিচার বিভাগের দৃশ্যমান রাজনীতিকরণ নিয়ে জনঅসন্তোষ বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সম্পদের হিসাব: সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পদের বিবরণ নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়। উক্ত বিবরণীতে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের অস্তিত্ব পাওয়ায় দুদক কিছু রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে কিন্ত সংশ্লিষ্ট কিছু রাজনীতিবিদ যখন দাবি করে যে তারা সম্পদ বিবরণীতে ভুল করেছে তখন দুদক তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রত্যাহার করে নেয়।

জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার: আইন অনুসারে জনগণ সরকারের বিভিন্ন অফিসের তথ্য জানার অধিকার রাখে, কিন্তু এই আইন ছিল অকার্যকর। এই আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব তথ্য কমিশনের। কমিশন কিছু ব্যাতিক্রম ব্যাতিরেকে যেমন জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন তথ্য ছাড়া বাকি সব তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করে। যদিও তথ্যগ্রহীতাকে তথ্যলাভের জন্য পদ্ধতিগতভাবে আবেদন করতে হবে এবং নূন্যতম একটি ফি দিতে হবে। কোন কর্মকর্তা তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানালে কমিশন তার বিরুদ্ধে সমন জারি করতে পারবে এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ হাজির করতে বাধ্য করতে পারবে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে জনগণনের বিরাট একটি অংশ এ আইনের ব্যাপারে সচেতন না হওয়ায় এবং তথ্যপ্রাপ্তির যাবতীয় পদ্ধতি অনুসরণে তাদের সক্ষমতা সীমিত হওয়ায় সরকার ওই বছর এ আইনের আওতায় অল্প কিছু সংখ্যক মামলা দায়ের করেছে। কমিশন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করেছে এবং সরকারি কমর্কর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে যাতে তারা এই আইন কার্যকরে উৎসাহী হয়।

সেকশন ৫। মানবাধিকার লংঘন অভিযোগের আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি তদন্তের প্রতি সরকারের মনোভাব

বিভিন্ন ধরনের দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সাধারণত স্বাধীনভাবেই কাজ করে থাকে, যেমন মানবাধিকারের উপর নানা কেইস তদন্ত করা এবং এর উপর প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানবাধিকার সংস্থা সরকারের তীব্র সমালোচনা করে থাকে, তারা অনেক সময় নিজেদের সমালোচনাও করেছে। সাধারণত সরকারী কর্মকর্তাগণ এসব ক্ষেত্রে সহযোগীতা করেন না এবং নিজেদের মতামতও প্রকাশ করেন না।

২০১৩ সালে অধিকার নামের একটি মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর থেকে সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থ বরাদ্দ করা বন্ধ করে রেখেছে এবং এর পরিচালনা কার্যও নিষিদ্ধ করে রেখেছে। বহু একক পর্যবেক্ষণকারী মনে করেন যে প্রতিবেদনটিতে হেফাজত-ই-ইসলামের র‍্যালিতে সরকারের বলপ্রয়োগের ঘটনাটি বেশিমাত্রায় অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে উপস্থাপিত মৃতের সংখ্যার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা সংখ্যার ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। অধিকারের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে গ্রেফতারকৃত সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং প্রেসিডেন্ট নাসিরুদ্দিন এলানকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে তবে তাদের বিরুদ্ধে চার্জ এখনো বহাল আছে। অধিকারের প্রতিবেদনে সংস্থাটির বিদেশী সাহায্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়া ও এর অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে তদন্ত সংক্রান্ত হয়রানি সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করা হয়। পরিবারের সদস্যগণ এবং অধিকারের স্টাফ অন্যান্য নানা ধরনের হয়রানির দাবি করেন, এছাড়া তাদের সকল টেলিফোন কথোপকথন, ইমেইল এবং গতিপ্রকৃতি নিরাপত্তা কর্মকর্তা দ্বারা সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন।

সরকার ধর্মভিত্তিক সংস্থাসহ সকল এনজিওকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিবন্ধিত করার আদেশ দিয়েছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক এনজিও যারা সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কাজ করছে যেমন মানবাধিকার, আদিবাসী সম্প্রদায়, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বা শ্রমিক অধিকার, তারা সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। রোহিঙ্গা উদবাস্তুদের নিয়ে কাজ করা একটি আন্তর্জাতিক এনজিও দাবি করেছে যে সরকার তাদের কাজে বাধা প্রয়োগ করেছে। এই সংস্থাগুলো আরো দাবী করেছে যে গোয়েন্দা সংস্থা তাদের কাজে নজরদারি করেছে। সরকার অনেকসময় প্রজেক্ট নিবন্ধনে বিলম্ব, সিজ-এন্ড-ডিসিস্ট চিঠি বা ভিসা প্রদান না করে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে কাজে বাধা প্রদান করেছে।

এসব সমালোচনার জবাব সরকার মিডিয়ার মাধ্যমে দিয়ে থাকে, কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো হুমকি দিয়ে আবার কখনো কোর্টের মাধ্যমে (সেকশন ১. ঙ. দেখুন)। আগস্টে পুলিশের একটি বয়ানে অধিকারের বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বিষয়ক প্রতিবেদনকে নাশকতামূলক অপপ্রচার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং বলা হয় যে এটি আইনের শাসনের প্রতি হুমকি স্বরূপ। অক্টোবরে আরেকটি পুলিশি বয়ানে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বিষয়ক প্রতিবেদনকে আইন ও মানবাধিকার ভিত্তিক এনজিও আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (এএসকে) জন্য মানহানিকর এবং জাতির আইনের শাসনের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

জাতিসংঘ বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাঃ অভিবাসীদের জন্য আন্তঃসরকার আন্তর্জাতিক সংস্থা বছরের শেষের দিকে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগীতা বৃদ্ধি পাবার কথা প্রকাশ করেছে।

সরকারি মানবাধিকার সংস্থাঃ এনএইচআরসি তে সাতজন সদস্য আছেন যার মধ্যে পাঁচজন অবৈতনিক পদাধারী। পর্যবেক্ষকগণ লক্ষ্য করেছেন যে সরকারের এনএইচআরসি এর দলটি ছোট, এর সদস্যসংখ্যা অপ্রতুল ও এটি আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। এনএইচআরসি এর প্রাথমিক কাজ ছিল জনগণকে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, এবং এনএইচআরসি এর চেয়ারম্যান মিডিয়াতে বহুবার এ সম্পর্কে বলেছেন। মানবাধিকার রক্ষা ও উৎসাহদানের জন্য ইন্টারন্যাশনাল কোঅরডিনেটিং কমিটি অব ন্যাশনাল ইন্সটিটিউশন্স লক্ষ্য করেছে যে এনএইচআরসি এরকম সংস্থার যে আন্তর্জাতিক মানদন্ড নির্দিষ্ট রয়েছে তার থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। সংস্থাটি বিশেষ করে জোর দিয়েছে এনএইচআরসি এর কমিশনার

নির্বাচন করার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব এবং এর নিজস্ব স্টাফ নিয়োগকারি একটি কর্তৃপক্ষের অভাবের উপর। আগস্ট মাসে এনএইচআরসি এর চেয়ারম্যান সংস্থাটির কাজে স্বাধীনতা দাবি করে একটি উন্মুক্ত আবেদন করেন।

সেকশন ৬। বৈষম্য, সামাজিক নির্যাতন ও মানব পাচার

দেশের আইন বিশেষ ভাবে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক কিছু বিষয় নিষিদ্ধ করেছে, নারী ও শিশু নির্যাতনে অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিচার ও কঠোর শাস্তি প্রদান, ভিক্টিম বা শিকারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া, তদন্তকারী কর্মকর্তা তার দায়িত্বে অবহেলা করলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যার্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে এর প্রয়োগ খুব দূর্বল। তালাক, সন্তানের হেফাজত নেয়া ও ধর্ষণ বিষয়ক আইন একজন ব্যাক্তির ধর্মের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয় এবং প্রায়ই এটি মহিলা ও মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক হয়ে থাকে। নারী, শিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আদিবাসী, যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রায়শই নানা ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

নারী

ধর্ষণ ও পারিবারিক নির্যাতনঃ ধর্ষণ ও স্বামী কর্তৃক শারিরিক নির্যাতন আইনত নিষিদ্ধ। বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। লিঙ্গ-ভিত্তিক নির্যাতন বরাবরই একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকের নারীর প্রতি নির্যাতন জরিপ ২০১১ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২৬ শতাংশ নারী তাদের বর্তমান স্বামী কর্তৃক জীবনের কোন না কোন সময়ে ধর্ষণের স্বীকার হয়েছেন। এ বছরে এএসকে (আইন ও সালিশ কেন্দ্র)কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে, ২৮ শতাংশ ক্ষেত্রে এটি ছিল গণধর্ষণ এবং ৭ শতাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষনের পর শিকারকে খুন করা হয়; ১৭ শতাংশ ভিক্টিমের বয়স ১৩ থেকে ১৮ বছর, ১৯ শতাংশ ক্ষেত্রে ভিক্টিমের বয়স সাত থেকে ১২ বছর এবং পাঁচ শতাংশ ক্ষেত্রে ভিক্টিমের বয়স ছয় বছর বা এর কম। অন্তত একজন ছয় বছরের কম বয়স্ক শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের ধারণা অনেক ভুক্তভোগীই ধর্ষণের রিপোর্ট করে না যার কারণ আইনি সহায়তার অভাব, সামাজিক কলংক, ভবিষ্যতে আরো হয়রানির আশংকা এবং সাক্ষী উপস্থাপনের আইনি শর্ত। এর ফলে ধর্ষকদের বিচার দুর্বল ও অসংগতিপূর্ণ রয়ে যায়। আগস্টে হাই কোর্টের আদেশে একটি সরকারি কমিটি গঠন করা হয় যা "দুই-আঙ্গুল" ধর্ষণ পরীক্ষার পরিবর্তে অন্যান্য মেডিকেল পরীক্ষা পরিচালনা করার প্রস্তাব করে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওমেন লইয়ারস এ্যাসোসিয়েশন (বিএনডব্লিউএলএ)রিপোর্ট করেছে যে কিছু দুষ্কৃতিকারী ধর্ষণের ছবি ও ভিডিও মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় যাতে করে ভিক্টিম ও তার পরিবার সমাজে অসম্মানিত ও হেয় প্রতিপন্ন হয়।

২০১৩ সালে জাতিসংঘের মাল্টিএজেন্সি নারীর প্রতি নির্যাতন বিষয়ক একটি স্টাডির প্রতিবেদন প্রকাশ করে, এতে ১৮ থেকে ৪৯ বছর বয়সের ২,৪০০ পুরুষের উপর জরিপ করা হয়, একটি শহর এলাকায় ও একটি গ্রামাঞ্চলে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ শহরবাসী পুরুষ এবং ৫৭ শতাংশ গ্রামবাসী পুরুষ জানায় তারা নিজেরাই নারীদের প্রতি শারিরিক এবং/অথবা যৌন নির্যাতন করেছে। জরিপে আরো বলা হয় সুষ্ঠু বিচারের অত্যন্ত নিম্ন মাত্রা ধর্ষকদের মধ্যে একটি বিনা শাস্তির অভ্যাস তৈরি করেছে এবং এতে করে অপরাধীরা আরো অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে। অংশগ্রহণকারীদের

মধ্যে সর্বমোট ৮৮ শতাংশ গ্রামবাসী ও ৯৫ শতাংশ শহরবাসী পুরুষ জানায় যে ধর্ষনের দায়ে তাদের কোন রকমের আইনি জটিলতায় পড়তে হয়নি।

১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ) উদযাপনের সময় একাধিকবার প্রকাশ্য যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। আনুমানিক ৩০ জন বর্বর তরুন প্রায় ২০ জন নারীকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নিপীড়ন করে, আশেপাশের থেকে যার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তাদেরকে মারধোর করে। আক্রমণকারীরা ভিক্টিমের পোশাক ছিড়ে ফেলে, যার মধ্যে ছিল একটি ১০ বছরের মেয়ে যার শরীরে কামড়ের দাগ পাওয়া গিয়েছে। পাশে থাকা পুলিশ এই ঘটনা দেখেও দুষ্কৃতিকারীদের থামানোর জন্য কিছুই করেনি। জাহাঙ্গিরনগর ক্যাম্পাসে দুইজন নারীকে এবং জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির বাসে আরেকজন নারীকে লাঞ্ছিত করা হয়। এই ঘটনা সমাজে প্রবলভাবে নিন্দিত হয় এবং জনগনের মধ্যে এধরনের যৌন অপরাধের কারণ অনুসন্ধানমূলক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে।

মানবাধকার কর্মীরা বলেন অনেকসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই অপরাধের টার্গেট হয়ে থাকে যার মূলে আছে তাদের সামাজিক প্রভাবের অভাব। মে মাসে একজন ২১ বছরের গারো মেয়েকে একটি মাইক্রোবাসে পাঁচটি ছেলে গনধর্ষণ করে। মেয়েটি তার ঢাকার কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরছিল। হাই কোর্ট পুলিশকে এই কেসের প্রতি দ্রুত ব্যাবস্থা নেয়ার ও সরকারকে ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ দেবার আদেশ দেয়।

রাঙ্গুনিয়ায় ১৩ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষনের ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ মেয়েটি, তার ভাই ও পরিবারকে জেলে প্রেরণ করে এবং যে পুলিশ অফিসার ধর্ষনের প্রমাণ নষ্ট করে তাকে দোষমুক্ত করে। হা ই কোর্ট পরবর্তীতে রুল জারি করে পুলিশের শাস্তি প্রদান করে কেননা পুলিশ ধর্ষণের রিপোর্ট পেশ করতে ব্যার্থ হয় এবং দোষীকে সুরক্ষা প্রদান করে।

আইন অনুযায়ী পারিবারিক নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকার পারিবারিক নির্যাতনের শিকার মেয়েদের জন্য একটি গোপন হটলাইন ও বেশ কিছু ক্রাইসিস সেন্টার পরিচালনা করে। তবে ওমেন'স রাইটস এর কর্মীরা পারিবারিক নির্যাতনে এসব সেন্টারের নিষ্ক্রিয়তায় সরকারের সমালোচনা করেছে। সরকার থেকে নামমাত্র সহযোগীতা নিয়ে এনজিও গুলোই মূলত পারিবারিক নির্যাতন রোধের বেশিরভাগ প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক সহযোগীতা প্রদান করেছে। কোর্ট পারিবারিক নির্যাতনের বেশিরভাগ ভুক্তভোগীকে বিএনডব্লিউএলএ এর পরিচালিত শেল্টারের মত বিভিন্ন শেল্টার হোমে প্রেরণ করে। কিছু ক্ষেত্রে বিএনডব্লিউএলএ ভুক্তভোগীদের স্থানান্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্বল্প সময়ের জন্য জেলে প্রেরণ করে। পারিবারিক নির্যাতনের ভুক্তভোগীদের জন্য কিছু সাপোর্ট গ্রুপ আছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস ২০১৩ এর একটি জরিপ অনুযায়ী ৮৭ শতাংশ বিবাহিত মহিলা তাদের স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হন, এদের মধ্যে ৫০ শতাংশ গুরুতর আহত অবস্থায় আসেন।

<u>অন্যান্য ক্ষতিকর চিরাচরিত অভ্যাসঃ</u> কিছু এনজিও যৌতুক নিয়ে বিরোধের জেরে নারীদের প্রতি অত্যাচারের রিপোর্ট করেছে। ঠাকুরগাঁওতে একজন স্বামী যৌতুক দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ না করায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যা করে মৃতদেহ সেপ্টিক ট্যাংকে ডুবিয়ে দেয়।

সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের একটি রুলিং ফতোয়াকে (ধর্মীয় শরিয়া) শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ব্যাবহারের অনুমতি দিয়েছে; কোন শাস্তির উপযোগ্যতা বিবেচনার জন্য ফতোয়া জারি করা যাবে না, এবং কোন ধর্মনিরপেক্ষ আইনকে এটি কখনো রহিত করতে পারবে না। ইসলামের প্রথা অনুযায়ী শুধুমাত্র ধর্ম বিষয়ক পন্ডিত যাদের ইসলামের আইন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান আছে তারাই কোন ফতোয়া জারি করতে পারবেন। এরকম বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও গ্রামের কিছু ধার্মিক নেতারা প্রায়ই বিভিন্ন ফতোয়া জারি করেন। এসব ফতোয়ার ফলে বিচারবহির্ভূত শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটে থাকে, বিশেষ করে নারীদের বিরুদ্ধে, অনুমিত নৈতিক অবক্ষয়ের অভিযোগে। অনেকসময় ফতোয়াদানকারী ধার্মিক নেতাদের নির্দেশে মেয়েদেরকে তীক্ষ্ম নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। এসব শাস্তির মধ্যে আছে চাবুক দিয়ে মারা, পিটানো ও অন্যান্য শারিরিক অত্যাচার। অক্টোবরে গাজিপুরের সালিশের প্রধান মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন ও তার সঙ্গীরা মিটিং এ ডাকার পরও না আসার অপরাধে একজন মহিলাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অচেতন করে দেয়। মহিলাটিকে তার আঘাতের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এসিড সন্ত্রাস, যদিও আগের তুলনায় কমেছে, এখনো একটি গুরুতর সমস্যা। আক্রমণকারীরা শিকারের মুখে এসিড ছুড়ে দেয় যাতে তাদের- সাধারণত মেয়েদের- চেহারা বিকৃত হয়ে যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্ধ হয়ে যায়। এসিড সন্ত্রাস মূলত বিয়ের প্রস্তাবে অসম্মতি জানানো বা জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের হিসেবে ঘটানো হয়। দেশের আইন এসিডের সহজপ্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা ও নারীদের উপর এসিড সন্ত্রাস কমানোর চেষ্টা করছে, তবে আইন বিষয়ক সচেতনতার অভাব এবং আইনের দূর্বল প্রয়োগের কারণে এর প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ছে। সরকার দুষ্ক্রিতিকারীদের শাস্তি প্রদান ও সাধারণ জনগণের জন্য এসিডের প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শুধু কিছু সম্পর্কিত বাণিজ্য সংস্থার কাছেই এসিড বিক্রির অনুমতি দিয়েছে; যদিও সরকার এই নিষেধাজ্ঞা সর্বসাধারণের উপর প্রয়োগ করতে পারে নি। এসিড নিক্ষেপের বিচারকার্য দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে যেখানে সাধারণত জামিনের ব্যাবস্থা নেই। এসিড সার্ভাইভারস ফাউন্ডেশন এর মতে, এই বিশেষ ট্রাইবুনাল কার্যকর ছিল না এবং শাস্তির মাত্রা ছিল খুবই নগন্য।

একটি বিশিষ্ট স্থানীয় এনজিও জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ২৫টি এসিড আক্রমণের ঘটনা রিপোর্ট করে। জানুয়ারিতে ময়মনসিংহের মোহাম্মাদ শামিম কলেজের দ্বিতিয় বর্ষে পড়া একটি মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য এসিড ছুড়ে মারে। মেয়েটিকে কপাল ও এক চোখ পুড়ে যাওয়া অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

যৌন হয়রানিঃ হাই কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে, একান্তে বা প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি নিষিদ্ধ। এই নির্দেশনা মেনে চলার ব্যাপারে নজরদারি ও আইনের প্রয়োগ খুবই দুর্বল; ফলে এই ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেই চলছে এবং এর জন্য অনেক সময় মেয়েরা স্কুলে বা কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকছে। জুন মাসে সিরাজগঞ্জে মমতাজ খাতুন নামের একটি ১২ বছরের মেয়ে আত্মহত্যা করে কারণ তাকে এক লোক স্কুলে আসা যাওয়ার পথে বিরক্ত করত এবং এমনকি টেলিফোনেও তাকে হয়রানি করা হয়েছে।

প্রজনন অধিকারঃ ব্যাক্তি ও দম্পতির তারা কতজন সন্তান নেবে, কত দিন পর পর নেবে এবং কখন নেবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার রয়েছে; তাদের নিজেদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য জানা ও উপায় অবলম্বন করার বিষয়েও তাদের স্বাধীনতা রয়েছে; এবং এতে কোন রকম বৈষম্য, বলপ্রয়োগ ও অত্যাচার

করা যাবে না। তবে সিভিল সোসাইটি সংস্থার তথ্য মতে বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েরা এ ধরনের কোন সেবা পায় নি। দম্পতি ও ব্যাক্তির যেকোন প্রকার জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করার সুবিধা আছে, এতে দীর্ঘ্য মেয়াদি গর্ভনিরোধক পরিকল্পনা এবং স্থায়ী পদ্ধতিও অন্তর্ভুক্ত। ফার্মাসিগুলো পরিবার পরিকল্পনার নানা ধরনের বিকল্প ব্যাবস্থা সরবরাহ করেছে এবং ২০১১ সালের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে অনুযায়ী তাদের ৩৩ শতাংশ পরিবার পরিকল্পনা পণ্য সারাদেশে বিক্রি হয়েছে। যদিও আয় ও শিক্ষার নিম্ন মাত্রা, পরিবারের চিরায়ত ভূমিকা অনেক সময় এসব পদ্ধতি গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এছাড়া বেশিরভাগ নিম্ন-আয়ের পরিবার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করে থাকে যা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়; সার্ভেতে আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাবহারের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় নি।

২০১০ সালের বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যুহার জরিপ অনুযায়ী, বিগত নয় বছরের তুলনায় মাতৃ মৃত্যু হার ৪০ শতাংশ কমেছে, প্রতি ১০০,০০০ জীবিত শিশু জন্মদানে মাতৃ মৃত্যু সংখ্যা ৩২২ থেকে কমে হয়েছে ১৯৪। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক মৃত্যুর কারণ প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ ও খিঁচুনি, ৭ শতাংশ ক্ষেত্রে ব্যাহত বা দীর্ঘ প্রসব বেদনা। ২০১৩ সালের ইউটিলাইজেশন অব এসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি (ইউইএসডি)জরিপ অনুযায়ী, অভিজ্ঞ প্রসব সহায়ক (দাঈ)৩৪ শতাংশ প্রসব সংঘটিত করেন, আর ৩৩ শতাংশ প্রসব সংঘটিত হয় কোন না কোন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারি স্থানে, যা ২০১১ সালে ছিল যথাক্রমে ৩২ ও ২৯ শতাংশ। যদিও ৫৫ শতাংশ মহিলা অন্তত একবার মেডিকেলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যাক্তি দ্বারা প্রাকপ্রসব চেক আপ করিয়েছেন, মাত্র ২৬ শতাংশ মহিলা জন্মদানের পর প্রয়োজনীয় চারটি চাক আপের সবগুলো করিয়েছেন। প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর কাছ থেকে জন্মদানের দুই দিনের মধ্যে চেক আপ করানো মহিলা মাত্র ২৭ শতাংশ।

<u>বৈষম্যঃ</u> সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান, সবাই একই সমান ভাবে আইনের সুরক্ষা পায়। এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নারীদের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে "রাষ্ট্রীয় ও সাধারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে"। তথাপি, মেয়েরা পরিবারে, সম্পত্তিতে ও উত্তরাধিকার আইনে ছেলেদের সমান সুবিধা পায় না। ইসলামিক উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী, কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের অর্ধেক পরিমান সম্পত্তি উত্তরাধিকার হিসেবে পায়; কোন পুত্রসন্তান না থাকলে সকল দেনা পরিশো ধ ও দায় মেটানোর পর যা অবশিষ্ট থাকে তা কন্যা সন্তান পায়। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী, কোন হিন্দু নারীর স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই শুধু স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে এবং তার মৃত্যুর পর কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তির মালি ক হবে।

কোন ফ্যাক্টরির কাজে পদোন্নতি পেতে, টাকা পয়সা সংক্রান্ত কাজে বা অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজে সুযোগ পেতে মেয়েদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়, অথচ সরকারের ন্যাশনাল ওমেন'স ডেভেলপমেন্ট পলিসিতে চাকুরী ও ব্যাবসায় নারীদের সুযোগ দেয়ার অঙ্গিকার করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে। (সেকশন ৭ ঘ দেখুন)।

শিশু

জন্ম নিবন্ধনঃ আইন অনুযায়ী দেশে কেউ জন্ম গ্রহন করলে সে সাথে সাথেই নাগরিকত্ব পায় না। কোন ব্যাক্তি তখনই নাগরিক হিসেবে গণ্য হয় যখন তার বাবা বা দাদা দেশের অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকায় জন্ম গ্রহণ করে থাকেন। যদি কোন ব্যাক্তি পূর্বপুরুষের কল্যাণে নাগরিকত্ব পায়, তার মানে তার বাবা বা দাদা নিশ্চই ১৯৭১ সালে বা এর পরে স্থায়ী ভাবে এই এলাকায় বসবাস করছেন। জাতীয় পরিচয় পত্র বা পাসপোর্ট করার জন্য জন্ম নিবন্ধন করা প্রয়োজন।

শিক্ষাঃ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয় যা বাধ্যতামূলক, সরকার মেয়েদেরকে উৎসাহিত করার জন্য দশম শ্রেনী পর্যন্ত তাদেরকে ভর্তুকি দিয়ে থাকে। যদিও শিক্ষকদের বেতন ও স্কুলের পোষাক অনেক পরিবারের জন্যই ব্যায়বহুল হয়ে পড়ে, তবে সরকার শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়াতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে লাখ লাখ পাঠ্যবই সরবরাহ করে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে - মেয়ের সংখ্যা সমান দেখা যায় তবে উভয়ের ক্ষেত্রেই শিক্ষা অর্জনের মান নিম্ন। এছাড়া মধ্যমিক শ্রেণিগুলোতে ধীরে ধীরে মেয়েদের সংখ্যা কমতে থাকে। ২০১০ সালের শিক্ষা পলিসি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে, তবে যেহেতু আইনীভাবে কোন সংশোধনী আনা হয়নি তাই এই পলিসিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। সরকার স্কুলে আসা ছেলেমেয়েদের পরিবারকে যে সুবিধা দিয়ে থাকে তার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা অনেক বেড়েছে, তবে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু প্রচ্ছন্ন স্কুল ফি এর কারণে হতদরিদ্র পরিবার তাদের সন্তান বিশেষ করে মেয়ে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছে না। অনেক পরিবারই ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে তাদেরকে অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে লাগায় বা গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত করে। এছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতা দুর্গম এলাকা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়-প্রবণ এলাকায় অপর্যাপ্ত। বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ মাধ্যমিক শ্রেণিতে মেয়েদের সংখ্যা হ্রাসের একটি বড় কারণ।

শিশু নির্যাতনঃ আইন অনুযায়ী শিশু অধিকার অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে থাকলেও, সীমিত পুঁজি এবং প্রয়োগ ও নজরদারী করার দক্ষতার অভাবের কারণে এই আইনের প্রয়োগের অভাব দেখা যায়। মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সবথেকে কম রিসোর্স বা পুঁজি সম্পন্ন নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অধীনে শিশুদের দায়ভার থাকায় এর পরিচালনা ব্যাবস্থা হয় খুবই দুর্বল। শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ, যেমন, যৌন নিপীড়ন, শারিরিক ও আপমানজনক শাস্তি, সন্তান বিসর্জন, অপহরণ, পাচার ইত্যাদি সবসময়ই অত্যন্ত গুরুতর ও ব্যাপক সমস্যা হিসেবে রয়ে যায়। সমাজের সকল ক্ষেত্রেই শিশুরা নির্যাতনের হুমকীর মুখে থাকেঃ নিজের বাসায়, স্কুলে, গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত থাকলে সেই বাড়িতে, এলাকাভিত্তিক সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে। স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা পুরো বছর জুড়ে ১৭ বছরের কম বয়সী মেয়েদের অসংখ্য ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টার খবর রিপোর্ট করেছে (সেকশন ১ গ দেখুন)।

২০১৪ সালের মার্চ মাসে মিরপুর এলাকায় পাঁচ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণের দায়ে একজন শিক্ষককে কোর্ট মে মাসে মৃত্যুদণ্ড ও ২০০,০০০ টাকা (২,৫০০ ডলার) জরিমানা করে শাস্তি প্রদান করে।

কিছু অগ্রগতি, যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি নজরদারি করার এজেন্সি গঠন করা হলেও শিশু পাচার এবং উদ্ধারকৃত শিশুদের দেখভাল ও সুরক্ষায় অপর্যাপ্ত মান এখনো একটি বড় সমস্যা হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। কিছু শিল্পে, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক সেক্ট রগুলোতে কর্মক্ষেত্রে শিশু শ্রম ও শিশু নির্যাতন এখনও বহাল আছে, এছাড়া বাড়ির কাজে নিয়োজিত শিশুরাও তাদের অনানুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে সব ধরণের নির্যাতনের হুমকীর মুখে থাকে (সেকশন ৭ গ দেখুন)।

জুলাই মাসে একদল লোক সামিউল ইসলাম রাজন নামের ১৩ বছর বয়সী একটি সবজি বিক্রেতা ছেলেকে রিকশা চুরির দায়ে ধাতব রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। হত্যাকারী লোকগুলো সামাজিক মাধ্যমে এই নৃশংস মারের ২৮ মিনিটের একটি ভিডিও পোস্ট করে। এই ঘটনার এক মাসের মধ্যে, মোহাম্মদ রাকিব নামের মোটরসাইকেলের ওয়ার্কশপে কাজ করা একটি ১২ বছরের ছেলেকে তার পূর্ববর্তী চাকুরীদাতা মেরে ফেলে। সেই চাকরীদাতা ছেলেটির মলদ্বারে কম্প্রেসারের পাইপ ঢুকিয়ে তা ছেড়ে দেয় যার ফলে ছেলেটির অন্ত্র ও ফুসফুস ফেটে যায় এবং ছেলেটি মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ এই দুই ঘটনায় বেশ কিছু লোককে গ্রেফতার করে, এবং এই দুইটি হত্যা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিশু শ্রমিক দের উপর নির্যাতন ও এর নজরদারির অভাবের বিষয়ে ব্যাপক জনরোষ সৃষ্টি করে। নভেম্বর মাসে কোর্ট রাজন কেইসে চারজন ও রাকিব কেইসে দুইজনকে মৃত্যুদন্ড দেয়।

বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহঃ যদিও আইনতভাবে মেয়েদের ও ছেলেদের বিয়ের বয়স যথাক্রমে ন্যুনতম ১৮ ও ২১ বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে, বাল্যবিবাহ এখনো একটি গুরুতর সমস্যা। বাল্যবিবাহ প্রতিহতকরণ আইনের খসড়ায়, যা বছর জুড়ে তীব্র জাতীয় মতানৈক্যের বিষয় ছিল, বাল্যবিবাহ আয়োজন করার শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে বাবা-মা রাজী থাকলে দায়মুক্তির সুযোগ আছে; যার ফলে ১৬ বছরের মেয়েদের বিয়েকেও বৈধতা দেয়া যায়। বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান খুঁজে পাওয়া কঠিন, কেননা জন্ম নিবন্ধন ও বিবাহের নিবন্ধন সনদ বিচ্ছিন্ন। জাতিসংঘের "স্টেইট অব দ্যা ওয়ার্ল্ড'স চিল্ড্রেন ২০১৩" রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০২ ও ২০১১ এর মধ্যে বাংলাদেশের ২০ থেকে ২৪ বছরের মেয়েদের মধ্যে ৩২ শতাংশ মেয়েদের ১৫ বছর বয়সে এবং ৬৬ শতাংশ মেয়েদের ১৮ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। বাল্যবিবাহের মাত্রা কমানোর চেষ্টা হিসেবে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের পরেও মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের খরচ বহন করার ক্ষেত্রে উপবৃত্তির ব্যাবস্থা করেছে। সরকার ও বিভিন্ন এনজিও বাবা-মাদের জন্য নানা ধরনের জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করে যেখানে মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে না দেয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানো হয়।

অন্যান্য ক্ষতিকর চিরাচরিত অভ্যাসঃ যেহেতু মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৮ বছরের কম, ফলে শিশুরাও যৌতুক ও অন্যান্য বৈবাহিক সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে।

শিশুদের যৌন শোষনঃ শিশুদের প্রতি যৌন শোষনের দন্ড ধার্য করা আছে ১০ বছরের কারাদন্ড। ২০১৩ সালের শিশু আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচের সবাই শিশু। শিশুদের অশ্লিল ভাবে উপস্থাপন বা শিশুদের দিয়ে অশ্লীল কিছু বিপনন বা বিতরণ নিষিদ্ধ। পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী এর সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদন্ড ও ৫,০০,০০০ টাকা (৫,২৫০ ডলার) জরিমানা। ২০০৯ সালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল লেবর অর্গানাইজেশন (আইএলও) ও বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টীকস বাণিজ্যিকভাবে শিশুদের যৌন শোষনের একটি বেইসলাইন জরিপ সম্পন্ন করে। এই জরিপ অনুযায়ী, ১৮,৯০২ জন যৌন শোষনের শিকার শিশুদের মধ্যে ৮৩ শতাংশ শিশু মেয়ে, ৯ শতাংশ শিশু হিজড়া ও ৮ শতাংশ শিশু ছেলে। জরিপে আরো পাওয়া যায় এর মধ্যে ৪০ শতাংশ মেয়ে ও ৫৩ শতাংশ ছেলে ১৬ বছরের কম বয়সী, যা কিনা এই জরিপ চলাকালীন সময়ে সম্মতির বয়স হিসেবে বিবেচ্য হত।

আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণঃ দেশটি ১৯৮০ সালের সিভিল আস্পেক্টস অব ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড অ্যাবডাকশন এর উপর হওয়া হেইগ কনভেনশন এর সদস্য নয়। তথ্যের জন্য কমপ্লায়েন্সের উপর ডিপার্টমেন্ট অব স্টেইট এর রিপোর্ট দেখুনঃ
travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html

এবং দেশ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য দেখুনঃ
travel.state.gov/content/childabduction/en/country/bangladesh.html.

ইহুদীবিদ্বেষ

দেশে কোন ইহুদী সম্প্রদায় নেই, এবং ইহুদী বিদ্বেষ নীতি সম্পর্কিত কোন রিপোর্ট ও পাওয়া যায় নি, তবে কিছু খবরের কাগজ কখনো কখনো ইহুদী বিদ্বেষ মূলক আর্টিকেল প্রকাশ করে।

ব্যাক্তি পর্যায়ে পাচার

ডিপার্টমেন্ট অব স্টেইট এর ট্রাফিকিং ইন পার্সন রিপোর্ট দেখুনঃ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

প্রতিবন্ধি ব্যাক্তি

২০১৩ সালের প্রতিবন্ধি অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের অন্যান্যদের সমপর্যায়ের আচরণ পাবার ও বৈষম্যমুক্ত স্বাধীনতা পাবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে; তবে বাস্তবে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। আইন প্রতিবন্ধি প্রতিরোধ, চিকিৎসা, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, পুনর্বাসন, সামাজিক প্রতিরক্ষা, চাকরী, যাতায়াত সুবিধা ও আইনী সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

আইন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিবন্ধি ব্যাক্তির একটি পরিচয় পত্র থাকতে হবে যাতে করে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকুরীর সুবিধা পাওয়ার তথ্যাবলী অনুসরণ করা যায়। শারিরিক এই অক্ষমতার কারণে কাউকে যদি বিদ্যালয়ে, কর্মক্ষেত্রে বা উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তি বণ্টণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের বৈষম্যের শিকার হতে হয় তাহলে বৈষম্যকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি ৫,০০,০০০ টাকা (৬,২৫০ ডলার) বা তিন বছরের কারাদণ্ড। আইন ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ন্যাশনাল কোঅরডিনেশন কমিটি গঠন করেছে যার কাজ হল আইনের সকল উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সমস্ত সরকারি সংগঠন ও ব্যাক্তিমালিকানাধীন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা।

অ্যাকশন এগেইন্সট ডিসঅ্যাবিলিটি নামক একটি এনজিওর ভাষ্যমতে, প্রতিবন্ধি শিশুদের ৯০ শতাংশ কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নি। সরকার ইনক্লুসিভ এডুকেশন বা অন্তর্ভুক্তিকর শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধি বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করেছে। সরকার এমনকি প্রতিবন্ধিদের জন্য উপবৃত্তির ব্যাবস্থাও করেছে।

আইনে নতুন কোন বিল্ডিং বা ভবন তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিদের জন্য সুবিধা নিশ্চিত করার শর্ত দিয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ এইসব শর্ত পূরণ না করা ভবনের নকশাকেও অনুমোদন দিয়েছে।

আইন একজন শারিরিক ভাবে সক্ষম ব্যাক্তিকে তথ্য গ্রহণের যে অধিকার দিয়েছে, একজন প্রতিবন্ধিকেও সেই একই অধিকার প্রদান করেছে, তবে পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র অনেক সময় এই অধিকার কতখানি বাস্তবায়িত হবে তা নির্ধারণ করে থাকে। একজন প্রতিবন্ধি যেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাবহার করতে পারে তার জন্য আইন বিভিন্ন ব্যাবস্থা করেছে যেমন, জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বা ব্যাক্তিমালিকানাধীন মিডিয়া আউটলেটে ভিডিওতে সাব-টাইটেল যুক্ত করা, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইশারায় কথা বলা, স্ক্রীন রিডার্স (স্ক্রীনের ঘটনা বর্ণনা করে এমন একটি সফটওয়্যার) বা টেক্সট-টু-স্পীচ (লেখা পড়ে শোনায় এরকম একটি অ্যাপ্লিকেশন)যুক্ত করা। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এর ব্যাবহার করে, কিন্তু সাধারণভাবে মিডিয়ায় এই শর্ত পূরণ করা হয় না।

সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত সেবাসমূহে প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার আইন আছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজ সেবা বিভাগ ও জাতীয় প্রতিবন্ধি উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এই সংস্থাগুলোই প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ। বৈষম্য ও প্রসার জনিত সমস্যার কারণে প্রতিবন্ধি মানুষেরা অনেক সময় মূলধারার শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। সরকার কয়েক শত পণ্যের উপর শুল্ক কমিয়ে দিয়েছে যেমন, হুইলচেয়ার, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র (হিয়ারিং এইড), ব্রেইল মেশিন, অর্থোটিক্স ও প্রোস্থেসিস যা প্রতিবন্ধিদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

মানসিকভাবে প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের জন্য সরকারের চিকিতসার সুবিধা ছিল অপর্যাপ্ত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সকল পাবলিক মেডিকেল কলেজে স্নায়ুতান্ত্রিক অক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য শিশু উন্নয়ন সেন্টার গঠন করেছে। ব্যাক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু মেডিকেল ও কর্মমুখী পুনর্বাসন কেন্দ্র সহ প্রতিবন্ধিদের জন্য চাকরীর সুবিধাও সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো প্রতিবন্ধিদের জন্য সেবা ও উকিলি সহায়তা প্রদান করেছে। সরকার ৬৪ টি জেলায় প্রতিবন্ধিদের জন্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেছে যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে পুনর্বাসন ও সহায়ক যন্ত্র প্রদান করে থাকে। সরকার অটিজম বিষয়ে গবেষণা ও সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছে।

জাতীয়/বর্ণবাদী/জাতিগত সংখ্যালঘু

ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ ঘটে চলেছে, যদিও এই ধরণের আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য প্রায়ই অর্থনৈতিক এবং/অথবা রাজনৈতিক হয়ে থাকে।
সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সাক্ষী সুরক্ষার অভাবে জমি দখল নিয়ে বিরোধের সুরাহা করা এবং সন্দেহভাজনদেরকে বিচারের আওতায় আনার কাজকে অনেক সময় কঠিন করে তোলে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কেউ কেউ জানিয়েছে চাকুরী ও বাসা -বাড়িতে থাকার ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদেরকে ব্যাক্তিগতভাবে এই বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। এনজিও গুলোও রিপোর্ট করেছে যে জাতীয়তার উৎস,

বর্ণ ও উপজাতি সংখ্যালঘুদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু 'দলিত' (হিন্দু ধর্মের সবচাইতে নিচু জাতি) দের জমি, বসত বাড়ি, শিক্ষা ও চাকুরির সুবিধা সীমাবদ্ধ।

আদিবাসী মানুষ

আদিবাসী সম্প্রদায় ব্যাপক বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার হয়, যদি সরকার সিএইচটি (চিটাগং হিল ট্র্যাক্ট বা পার্বত্য অঞ্চল)এ বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের সরকারি চাকুরী ও উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করে থাকে যা ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তিতে উল্লেখ করা ছিল। সিএইচটি বাসী আদিবাসী মানুষেরা ভূমি কমিশনের গঠন ও নীতি নিয়ে বিবাদ থাকায় তাদের ভূমির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কঠোর নিরাপত্তা ব্যাবস্থা কিছু আদিবাসী ব্যাক্তি ও সক্রিয় কর্মীকে বৈষম্য নিরসন নিয়ে কাজ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আদিবাসী মানুষেরা সামাজিক অত্যাচারেরও শিকার হয়ে থাকে যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে ধর্ষণ ও খুন। এই সহিংসতা অনেক সময় জমি দখল এর সাথেও সম্পর্কিত থাকে। কাপাইং ফাউন্ডেশন, একটি আদিবাসী অধিকার বিষয়ে কাজ করা এনজিও, এর তথ্য মতে, আদিবাসী নারী ও মেয়েরা ক্রমবর্ধমানভাবে ধর্ষণ ও অন্যান্য অত্যাচারের শিকার হয়ে চলেছে, এবং বিচার ব্যাবস্থা এই ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা দিতে আর অপরাধীদের শাস্তি দানে বার বার ব্যার্থ হচ্ছে।

জানুয়ারীতে জমির মালিকানা নিয়ে দিনাজপুরে আদিবাসী সাঁওতাল গ্রামবাসী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যাক্তিদের মধ্যে বিরোধ বাড়তে বাড়তে তা অস্ত্র নিয়ে মারামারিতে পরিণত হয়। বেশিরভাগ সাঁওতাল বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় বা লুটপাট করা হয়, এবং আক্রমণকারীরা গ্রামের কূপের হ্যান্ড-পাম্প তুলে নিয়ে যায়। স্থানীয় সরকার পরে ভুক্তভোগীদের ত্রাণ বিতরণ করে। পুলিশ কিছু গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে কিন্তু রিপোর্ট করা হয় যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকে কাউকে গ্রেফতার করতে অনিচ্ছুক ছিল।

সংবিধানে আদিবাসী মানুষদের পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আদিবাসীদের মতে বাস্তবে তাদের পক্ষ হয়ে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কিছু এনজিও রিপোর্ট করেছে সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির বেলাতেও আদিবাসী সম্প্রদায় বৈষম্যের শিকার হয়। সিএইচটি কমিশন অনুযায়ী, ছয় থেকে দশ বছরের আদিবাসী শিশুদের মধ্যে অর্ধেকেরও কম শিশু কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যার কারণ অনেকাংশে আদিবাসী ভাষায় নির্দেশনার অভাব। আদিবাসী মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বসবাস ও স্বাস্থ্যসেবার সুবিধাও পায় না।
আদিবাসীদের কর্মীরা ও এনজিও গুলো জানিয়েছে যে সরকারী ও মিলিটারি গোয়েন্দা দিয়ে তাদেরকে নজরদারীর মধ্যে রাখা হয়।
কেন্দ্রীয় সরকার জমির ব্যাবহার সংক্রান্ত কর্তৃত্ব নিজের কাছে রেখেছে। ভূমি কমিশন, যা কিনা অবৈধভাবে দখলকৃত জমি নিয়ে তদন্ত করা ও ফিরিয়ে দেয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে, পুরো বছরে জমি সংক্রান্ত কোন বিরোধের নিষ্পত্তি করেনি। বাঙ্গালী ও আদিবাসী মানুষ এই কমিশনের গঠন ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

হিল ট্র্যাক্ট বা পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায় বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে জমি হারানোর কথা জানায়। সরকার মৌলভীবাজার ও মধুপুরের বনাঞ্চলে, যা গতানুগতিকভাবে আদিবাসীদের মালিকানায় আছে, বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ প্রকল্প করে যাচ্ছে।

লিঙ্গ পরিচয় ও যৌন অভিযোজন এর উপরর ভিত্তি করে সহংসতা, বৈষম্য ও অন্যান্য অত্যাচার

একই লিঙ্গের মানুষের সাথে যৌন কর্মকান্ড অবৈধ, তবে এই আইনের বাস্তবায়ন ঘটে নি। লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সচুয়াল, ট্র্যান্সজেন্ডার ও ইন্টারসেক্স (এলজিবিটিআই) গ্রুপ জানায়, পুলিশ এই আইনটি তাদেরকে, বিশেষ করে মেয়েলি পুরুষদেরকে, হয়রানি করার জন্য ব্যাবহার করে থাকে। কিছু গ্রুপ জানিয়েছে পুলিশ কোডের সন্দেহজনক আচরণ বিধির অধীনেও তাদেরকে হয়রানি করা হয়ে থাকে। যদিও সমাজে হিজড়া সম্প্রদায় কে অনেক আগে থেকেই স্বীকৃতি দান করা হয়েছে তবে সরকার ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ তে এলজিবি জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দান করেছে। সরকারের এই অবস্থান ২০০৯ সালের রিভিউ থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন, যেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন যে দেশে কোন এলজিবি ব্যাক্তি নেই।

দিঠি নামের একজন ব্যাক্তি দেশের প্রথম তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ যি নি সরকারি অফিসের প্রার্থী হিসেবে ডিসেম্বর মাসে সাতক্ষীরার স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

গে (স্বকামী পুরুষ)দের জন্য অনানুষ্ঠানিক বেশ কিছু সহায়ক নেটওয়ার্ক আছে তবে লেসবিয়ান (স্বকামী নারী)দের এমন সংস্থা খুবই দুষ্কর।

এলজিবিটিআই ব্যাক্তিদের উপর হামলার ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, তবে এই অপরাধগুলো নথিভুক্ত করা কঠিন কেননা ভুক্তভোগীরা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চায়। যৌন অভিযোজন নিয়ে তীব্র সামাজিক কলঙ্ক সাধারণভাবে বিদ্যমান থাকায় এই বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা হয় না। কিছু পাবলিক অনুষ্ঠান, যেমন রাজধানীর বাংলা নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে রংধনু-থিম বিশিষ্ট মিছিল মূলধারার সমাজে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এইচআইভি ও এইডস সংক্রান্ত সামাজিক কলঙ্ক

এইচআইভি ও এইডস এবং এতে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের নিয়ে সমাজে যে কলঙ্ক বা দুর্নাম তা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে হিজড়া সম্প্রদায়ে এবং যেসব পুরুষেরা পুরুষদের সাথেই মিলিত হয় তাদেরকে। সমাজে লিঙ্গের যে রীতি-নীতি তা অনেক সময় মেয়েদের এইচআইভি সম্পর্কে তথ্য ও সেবা গ্রহণের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। পিওপল লিভিং উইথ এইচআইভি স্টিগমা ইনডেক্স অনুযায়ী, এইচআইভি-পজিটিভ ব্যাক্তিদের সমাজ থেকে বহিষ্কার, একঘরে করা ও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। দেশে সর্বোপরি এইচআইভি সংক্রমণের মাত্রা ০.১ শতাংশের কম।

এইচআইভি/এইডস রোগীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের খবর সীমিত সংখ্যক। এনজিওগুলো মনে করে এর কারণ হল ভুক্তভোগীদের নিজেদের পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি এবং দেশে এইচআইভি/এইডস এর মাত্রা কম থাকার কারণে এটি নিয়ে গবেষণার অভাব।

অন্যান্য সামাজিক সহিংসতা ও বৈষম্য

কোন নজরদারী কমিটির (যেমন ফতোয়াবাজদের) দ্বারা হত্যার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে যতগুলো কেইস রিপোর্ট করা হয়েছে তা হয়ত বাস্তবে ঘটা সর্বমোট ঘটনার একটি ভগ্নাংশ মাত্র। অবৈধ ফতোয়া ও গ্রাম্য সালিশ, যাকে একটি বিশিষ্ট স্থানীয় এনজিও ধর্মীয় পন্ডিত ব্যাক্তি নয় বরং সমাজের নেতাদের আইন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে, এর মাধ্যমেও হত্যার ঘটনা ঘটেছে। জানুয়ারীতে নরসিংদিতে সাত জনকে ডাকাত সন্দেহে গণপিটুনিতে মেরে ফেলা হয়।

সেকশন ৭। শ্রমিক অধিকার

ক। এসোসিয়েশনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকারেইস

আইন ইউনিয়নে যুক্ত হওয়ার অধিকার দিয়েছে এবং সরকারের অনুমতিতে ইউনিয়ন গঠন করারও অধিকার দিয়েছে, যদিও ইউনিয়ন গঠন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের শর্ত পূরণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি ইউনিয়নের অনুমোদন দেয়ার জন্য কোন সংস্থার কমপক্ষে ৩০ শতাংশ কর্মীর সেই ইউনিয়নের সদস্য হতে হবে, এবং যখন সদস্য সংখ্যা ৩০ শতাংশের নিচে নেমে যাবে তখন মন্ত্রণালয় কোর্টকে সেই ইউনিয়ন বাতিল করে দেবার জন্য অনুরোধ করতে পারে। আইন অনুযায়ী দরদামের ইউনিট হবে ওয়াল-টু-ওয়াল (সম্পূর্ণ ফ্যাক্টরি)। শ্রম আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী কর্মীদের ম ধ্যে ব্যাবস্থাপনা, সুপারভাইজরি ও প্রশাসন বিভাগে কাজ করা চাকুরীজীবিরা অন্তর্ভুক্ত নয়। আগুন নির্বাপনকারী বাহিনী, নিরাপত্তা রক্ষী, ও চাকুরীদাতাদের গোপন সহকারিগণ কোন ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবে না। সরকারী চাকুরি ও নিরাপত্তা বাহিনীতে কাজ করা কারো জন্য কোন ইউনিয়ন গ ঠন করা নিষিদ্ধ। শ্রম আদালতের অনুমতিতে মন্ত্রণালয় অন্যান্য কারণেও কোন ইউনিয়নকে অনিবন্ধিত করতে পারে। আইন অনুযায়ী একটি ইউনিয়ন তার নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করার কেইসে আপিল করার অধিকার রাখে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৩ পর্যন্ত ৪০০ এর বেশি নতুন ইউনিয়ন নিবন্ধন করেছে, তবে সলিডারি সেন্টারের তথ্যমতে, এর বেশির ভাগ ইউনিয়নই এই বছর পর্যন্ত সক্রিয় নয়, যার কারণ কিছু ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিটিই বন্ধ হয়ে যাওয়া আবার কিছু ক্ষেত্রে চাকরিদাতাদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের প্রতি অন্যায্য আচরণ করা। বছর জুড়ে ইউনিয়নের জন্য আবেদনের সংখ্যা লক্ষ্যনীয়ভাবে কমেছে, আবেদন প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা বেড়েছে, এবং অনেক সম্ভাবনাময় ইউনিয়ন জানিয়েছে যে তাদেরকে এমন কিছু কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যা শ্রম আইনে লিপিবদ্ধ নেই। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ইউনিয়ন নিবন্ধনের প্রত্যাখ্যানের হার ছিল ঢাকায় ৭৩ শতাংশ (১৮৮টির মধ্যে ১৩৭টি) এবং চট্টগ্রামে ২০ শতাংশ (২০টির মধ্যে ৪টি)। সলিডারিটি সেন্টার অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন্ত্রণালয় ৫৯টি

ইউনিয়নকে নিবন্ধিত করেছে এবং ৪৮টিকে প্রত্যাখ্যাত করেছে, যেখানে ২০১৪ সালে নিবন্ধনের সংখ্যা ছিল ১৭৮টি ও প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা ছিল ৬৬টি।

আইন বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাসহ বৈধভাবে ধর্মঘট করার অধিকার দিয়েছে। উদাহরণস্বরুপ, সরকার কোন ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে যদি তা "সমাজের জন্য গুরুতর কষ্টের" কারণ হয় এবং ৩০ দিনের বেশি ধর্মঘট চললে সেটিও বাতিল করে দিতে পারে। আইন আরো দাবী করে যে কোন ফ্যাক্টরির বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রথম তিন বছরে কোন ধর্মঘট করা যাবে না অথবা যদি কোন ফ্যাক্টরি বিদেশি লগ্নির মাধ্যমে গঠিত হয় বা বিদেশি লগ্নিকারকের মালিকানাধীন কোন ফ্যাক্টরিতেও ধর্মঘট করা যাবে না।

আইনতভাবে নিবন্ধিত কোন ইউনিয়ন তাদের চাহিদার তালিকা উপস্থাপন করতে পারে এবং যৌথভাবে তাদের চাকুরিদাতার সাথে দরদাম করতে পারে; এটি কদাচিত ঘটে থাকে, তবে এরকম ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। আইন শ্রমিকদের প্রতি অন্যায্য আচরণের জন্য অপরাধীদের শাস্তির বিধান দেয় যেমন ইউনিয়নের সদস্যদের প্রতি তাদের বৈধ অধিকার প্রয়োগের কারণে প্রতিশোধমূলক আচরণ। শ্রম সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে অনেক কম্পানীর শ্রমিকরা তাদের যৌথ দরকষাকষি করার অধিকারকে প্রয়োগ করে না কেননা তাদের ইউনিয়নের অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যাবস্থাপনা বিভাগের সাথে মীমাংসা করার ভিন্ন উপায় আছে অথবা দর করার ফলে শাস্তির ভয়ে।

রাজ ওয়াশিং প্লান্ট এর শ্রমিকরা ২০১৪ সালের জানুয়ারীতে একটি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন করার পর ম্যানেজমেন্ট ৬০ জন কর্মীকে ছাটাই করেছে এবং ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা দাবী উপস্থাপনের অপরাধে অভিযোগ করেছে। ২০১৪ সালে ইউনিয়নটি কর্মী ছাটাই এর প্রেক্ষিতে শ্রম মন্ত্রণালয়ে শ্রমিকদের প্রতি অন্যায্য আচরণের দুইটি আলাদা অভিযোগ ফাইল করেছে কিন্তু বছরের শেষ পর্যন্ত এইসব কেইসের ফলে কোন প্রতিক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটে নি।

সলিডারিটি সেন্টার অনুযায়ী, অক্টোবর পর্যন্ত এখনো-সক্রিয় গার্মেন্ট সেক্টরের ইউনিয়ন ও তাদের ব্যাবস্থাপনা বিভাগের মধ্যে ১৫টি যৌথ দরকষাকষির চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে প্রাইম সোয়েটার ফ্যাক্টরির কর্মীদের ইউনিয়ন নিবন্ধিত হওয়ার পর তারা ইউনিয়নবিরোধী প্রতিশোধমূলক আচরণের রিপোর্ট করে। হয়রানি চলতেই থাকায়, ইউনিয়নটি শ্রম মন্ত্রণালয়ে বারংবার শ্রমিকদের প্রতি অন্যায্য আচরণের রিপোর্ট করে। অক্টোবর পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অমীমাংসিতই থেকে যায়।

আইনে বিভিন্ন পরিচালনামূলক কর্মকান্ডে চাকুরীদাতাদের হস্তক্ষেপ থেকে ইউনিয়নকে সুরক্ষিত রাখার ব্যাবস্থা আছে; যদিও বাস্তবে, বিশেষ করে রেডি-মেইড গার্মেন্ট শিল্পে, চাকুরীদাতাগণ প্রায়ই তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপে করে থাকেন। শ্রম সংস্থাগুলো ভীতি প্রদর্শন ও অত্যাচার, কর্মী ছাটাই, নিরাপত্তা সংস্থা ও জাতীয় গোয়েন্দ সংস্থার তদন্ত ইত্যাদির রিপোর্ট করেছে। শ্রম অধিকার এনজিওগুলো দাবী করেছে যে কিছু শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা পরে অন্য কোথাও চাকুরী পায় নি কেননা চাকুরীদাতারা তাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে।

২০১৩ সালে বলবত হওয়া শ্রম আইনের সংশোধনীতে বলা হয় ৫০ জনের বেশি কর্মী সম্পন্ন প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে একটি নির্বাচিত ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন কমিটি (ডব্লিউপিসি)গঠন করতে হবে। সেপ্টেম্বর

মাসের ১৫ তারিখে, সংশোধিত আইনে বাংলাদেশ শ্রম নীতির বাস্তবায়নের বিল পাস হয়। এই নীতিতে ডব্লিউপিসি নির্বাচনের প্রক্রিয়ার ধারা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভিন্ন একটি আইনের আওতায় বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (ইপিজেড) অথরিটি (বিইপিজেডএ বা বেপজা) এর অধীনে ইপিজেড সমূহে শ্রম অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইপিজেড আইন শ্রমিকদের নির্বাচিত কল্যাণ সংঘের সমিতি ও দর কষাকষি সংক্রান্ত বিষয়ে সীমিত পরিমাণ অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে; উদাহরণস্বরুপ, তাদের যৌথ দর কষাকষির অধিকার ও বিবাদে লিপ্ত সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার। ইপিজেড আইনের আগের সংস্করণে সব ধরণের ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করা ছিল এবং এর অন্যথায় কারাদন্ডের শাস্তির ব্যাবস্থা ছিল যা ২০১৩ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায়; তবে এখনও আইন ধর্মঘটের অধিকারকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সীমিত রেখেছে, যেমন বেপজা এর চেয়ারম্যান তার নিজস্ব বিবেচনায় যেকোন ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করতে পারেন যদি তিনি মনে করেন যে এটি জনস্বার্থের জন্য হুমকিস্বরূপ। আইন অনুযায়ী ইপিজেড লেবর ট্রাইবুনাল, আপিল ট্রাইবুনাল ও মীমাংসাকারী ব্যাবস্থা থাকার কথা, কিন্তু এই সংস্থাগুলো এখনও গঠিত হয় নি, বরং এর বদলে আটটি লেবর কোর্ট ও একটি আপিল লেবর কোর্টে সকল ইপিজেড কেইসের শুনানি হয়ে থাকে। বেপজার নিজস্ব তদন্ত ব্যাবস্থা আছে যেখানে শ্রম উপদেষ্টাগণ তদন্তকারী হিসেবে কাজ করেন। ইপিজেড শ্রমিকদের কোন সংঘ বাইরের কোন রাজনৈতিক দল, ইউনিয়ন বা এনজিওর সাথে সংযুক্ত হতে পারবে না।

ইপিজেড এ বৈধ কোন ধর্মঘটের কথা জানা যায় নি। বেপজা জানিয়েছে যে ২০১৪ সালে ফাইল করা ১১৪টি শ্রম-সংক্রান্ত কেইসের মধ্যে ৪২টির মীমাংসা হয়েছে আর বাকীগুলো এখনো শ্রম আদালতে বিচারাধীন আছে।

এসোসিয়েশনের অধিকারের সীমাবদ্ধতা এবং ইপিজেড গুলোতে শ্রমিকদের সুরক্ষা ছাড়া, জাতীয় শ্রম আইন ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইউনিয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে যদি কোন শ্রমিককে চাকরীচ্যুত করা হয় তবে লেবর কোর্ট তাকে পুনর্বহালের জন্য আদেশ দিতে পারে।

সরকার সব ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য আইন কার্যকরভাবে বা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করে নি। উদাহরণস্বরূপ, শ্রম আইনে শ্রম আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা, বিরোধ মিটমাট ও সালিশের বাবস্থা করা হয়েছে এবং যৌথ দরকষাকষিতে ইউনিয়নের কর্মীদের কোন মীমাংসায় না পৌঁছানোর প্রেক্ষিতে ধর্মঘট ডাকার অধিকার রয়েছে। তবে বাস্তবে খুব অল্প সংখ্যক ধর্মঘট জটিল আইনি শর্ত পূরণ করেছে এবং কিছু ধর্মঘট ও ওয়াকআউট স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছে, বিশেষ করে যেসব কর্মক্ষেত্রে ইউনিয়ন অনুপস্থিত।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের রিসোর্স বা পুঁজি তদন্ত ও কোন সমস্যার কার্যকর সমাধানে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট নয়, মন্ত্রণালয় এর কোর্টে মামলা দায়ের না করে সরাসরি চাকুরীদাতাদের বরাদ্দ দেয়ার মত যথেষ্ট কর্তৃত্ব নেই। তবে মন্ত্রণালয় এর নিজস্ব কর্মীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ও টেকনিক্যাল বা কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ৩৭০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আরো ৭২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। মন্ত্রণালয় নতুন প্রশিক্ষিত তদন্তকারী নিয়োগ দিয়েছে যাতে করে মোট তদন্তকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮৪ জন। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে তারা ২০১৪ সালে শ্রম আইন ভঙ্গের দায়ে ১,৫৪৬,২৪০ টাকা (১৯,৩৩০ ডলার) জরিমানা করেছে।

২০১৩ সালে আইন ভঙ্গের শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়েছে, এবং এই শাস্তি আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বলবত করা হয়েছে। প্রথমবারের মত আইন ভঙ্গের জন্য ২৫,০০০ টাকা (৩১৩ ডলার) জরিমানা নির্ধারিত করা হয়েছে; এবং দ্বিতিয়বার ভঙ্গের জন্য এই পরিমাণ দ্বিগুন করা হয়েছে। আইনে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদন্ডেরও বিধান আছে। যদি আইন ভঙ্গের ফলে কারো মৃত্যু হয়ে থাকে তবে আই ন ১,০০,০০০ টাকা (১,২৫০ ডলার) জরিমানা, চার বছরের কারাদন্ড বা উভয়ই শাস্তি হিসেবে প্রদান করতে পারে। প্রশাসনিক ও জুডিশিয়াল আপিলের ক্ষেত্রে দীর্ঘসুত্রিতা দেখা গিয়েছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ভার্সেটাইল টেক্সটাইল লিমিটেড নামক একটি ফ্যাক্টরির বিকাশমান ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ ফ্যাক্টরির ব্যাবস্থাপনা বিভাগ–সম্ভাব্য ইউনিয়ন নয়–মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রবেশাধিকার দেয় নি।

ঢাকা ডায়িং গার্মেন্টস এর শ্রমিকরা তাদের ইউনিয়নের নিবন্ধনের জন্য তিন দফা চেষ্টা করে। শ্রমিকদের ভাষ্যমতে, মন্ত্রণালয় দুইবার অবৈধ বা অন্যায় কারণ দেখিয়ে নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করে। তৃতীয়বারের মত চেষ্টার পর, মন্ত্রণালয় ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে যায় এবং শ্রমিকরা জানায় যে কর্মকর্তাগন শ্রমিকদেরকে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যেতে প্ররোচিত করে। শ্রমিকরা আরো দাবী করে যে মন্ত্রণালয়ের সুপা রভাইজররা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনকে অর্থ দিয়ে নিবন্ধনের চেষ্টা রহিত করার চেষ্টা করে।

খ। জোরপূরবক বা বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা

আইন সকল প্রকার জোরপূরবক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। জোরপূর্বক বা দাসভিত্তিক শ্রম আদায়ের শাস্তি হিসেবে পাঁচ থেকে ১২ বছরের কারাদন্ড ও অন্তত ৫০,০০০ টাকা (৬২৫ ডলার) জরিমানার বিধান রয়েছে। তদন্তকারী ব্যাবস্থা যা জোরপূর্বক শ্রম আদায়ের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ করে কার্যকরভাবে কাজ করেনি। রিসোর্সেস, তদন্ত ও মীমাংসার চেষ্টা ছিল অপর্যাপ্ত। আইন আরো নির্দেশ দেয় যে জোরপূর্বক শ্রম আদায়ের শিকার কর্মীকে বাসস্থান ও অন্যান্য সুরক্ষাকারী সেবার নিশ্চয়তা দিতে হবে যেমনটি দেয়া হয় পাচারের শিকার ভুক্তভোগীদেরকে।

দেশের বাইরে কাজে নিয়োগকৃত কিছু শ্রমিকরা পরে ধোঁকাবাজ চাকুরীদাতার পাল্লায় পরে সেখানে গিয়ে অত্যাচারের শিকার হয়, যেমন জোরপূর্বক শ্রম আদায় বা ঋণ বন্ধকীর মত ঘটনা।

বাসাবাড়ির কাজ এবং দাসভিত্তিক শ্রম আদায়ের কিছু ঘটনা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের বাড়ির কাজে এবং চুক্তিভিত্তিক কাজে বাধ্য করা হয় যেখানে তাদের চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা, বেতন না দেয়া, হুমকী ও শারিরিক ও যৌন নির্যাতনের মত অত্যাচারের মুখোমুখী হতে হয় সেকশন ৭ গ দেখুন)।

ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটস এর ট্রাফিকিং ইন পারসন'স রিপোর্ট দেখুনঃ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

গ। শিশু শ্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা ও কাজের সর্বনিম্ন বয়স

আইন শিশুদের কাজ বা চাকরির অবস্থা নিয়ন্ত্রন করে, এবং এই নিয়ন্ত্রন কাজের ধরন ও শিশুর বয়সের উপর নির্ভর করে। কাজের জন্য সর্বনিম্ন বয়স হল ১৪ বছর, এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য সর্বনিম্ন বয়স হল ১৮ বছর। কিছু ক্ষেত্রে আইন শিথিল করা হয়েছে যেখানে ১২ বা ১৩ বছরের শিশুদেরকে নির্দিষ্ট কিছু হালকা কাজের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ছোটরা দিনে পাঁচ ঘন্টা করে সপ্তাহে ৩০ ঘন্টা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে পারবে অথবা দিনে সাত ঘন্টা করে সপ্তাহে ৪২ ঘন্টা অন্যান্য কর্মস্থানে কাজ করতে পারবে। আইন অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করত এহবে; ২০১৩ সালের সংশোধিত শ্রম আইন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কিশোরদের কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের আইন প্রয়োগ ব্যাবস্থা সর্বোপরি শহরাঞ্চলের অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল, এবং পোষাক রপ্তানি ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ সেক্টরের বাইরে এই আইন খুব সামান্যই প্রয়োগ করা হয়েছে। কৃষি ও অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর যেখানে সরকারের নজরদারি নেই সেখানে প্রচুর সংখ্যক শিশুকে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৬ সালের চাইল্ড লেবর ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশন এর অধীনে, চাইল্ড লেবর ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল শিশু শ্রম নিয়ন্ত্রনের দায়িত্বে আছে। কাউন্সিলের প্রথম সভা ২৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। সরকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু সুরক্ষার নেটওয়ার্ক তৈরির আদেশ দিয়েছে যাতে করে শিশুদের প্রতি অত্যাচারের উপর বড় পরিসরে সক্রিয় হওয়া যায়, এতে অন্তর্ভুক্ত আছে শিশু শ্রম, হস্তক্ষেপ নজরদারি করা এবং রেফার করার প্রক্রিয়া তৈরি করা।

শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তি নির্দিষ্ট করা আছে, যাতে ২৫,০০০ টাকা (৩১৩ ডলার) এর নামমাত্র জরিমানাও অন্তর্ভুক্ত আছে। এই শাস্তিগুলো অপরাধ দমনের জন্য খুবই অপ্রতুল। সরকার অনেক সময় বাসায় কাজের লোকের প্রতি অত্যাচারের জন্য বাসার মালিককে অভিযুক্ত করেছে। শ্রম মন্ত্রণালয় ২০১৪ সালে ৪০টি শিশু শ্রম লংঘনের মামলা দায়ের করেছে; তবে সাধারণভাবে, রিসোর্সেস, তদন্ত ও প্রতিকার মূলক পদক্ষেপ ছিল অপর্যাপ্ত।

অক্টোবরে প্রবল জনরোষের প্রেক্ষিতে পুলিশ জাটিয় ক্রিকেট দলের সদস্য কাজী শাহাদাত হোসেইন ও তার স্ত্রীকে তাদের বাসার কাজ করা ১১ বছর বয়সী মেয়ে মাহফুজা আখতারকে নির্যাতন করার অপরাধে গ্রেফতার করে। আখতারকে হোসেইনের বাসার কাছে একটি রাস্তায় শরীরে পোড়ার দাগ ও শারিরিক নির্যাতনের অন্যান্য চিহ্ন সহ উদ্ধার করার তিন সপ্তাহ পর পর্যন্ত হোসেইন আত্মগোপনে ছিলেন।

শিশু শ্রমের উপস্থিতি সব ক্ষেত্রেই ছিল, বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর যেমন গৃহস্থালির কাজে। আইওএলও অনুযায়ী আনুমানিক ৩.৭ মিলিয়ন শিশু কাজে নিয়োজিত আছে এবং এর মধ্যে ১,৩ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে। শিশুরা শিশু শ্রমের সবচাইতে খারাপ রূপে কাজে নিয়োজিত ছিল, প্রাথমিকভাবে কৃষিকাজের কিছু বিপদজনক কাজে। কৃষিকাজে নিয়োজিত শিশুরা বিপদজনক যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করা, ভারী বোঝা বহন করা ও ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যাবহার করার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। শিশুরা সাধারণত দীর্ঘ সময় জুড়ে, চরমভাবাপন্ন তাপমাত্রায় কাজ করে এবং ধারালো যন্ত্র দ্বারা আহত হওয়ার মাত্রাও অনেক বেশি। শিশুরা পাথর ও ইট ভাঙ্গা, রং করার কাজ, কামারের কাজে সহায়তা এবং দালান তৈরি করার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও অংশগ্রহন করে থা কে। শুটকী মাছ তৈরির শিল্পে জোরপূর্বক শিশু শ্রম নিয়োগের ঘটনা দেখা গিয়েছে, যেখানে শিশুরা ক্ষতকর রাসায়নিক

দ্রব্য, বিপদজনক মেশিন এবং দীর্ঘ সময়ের কাজের সান্নিধ্যে আসে। শহরাঞ্চলে শিশুরা রিকশা চালানো, ময়লা তোলা, রিসাইক্লিং, বিক্রি করা, ভিক্ষা করা, অটোমোবাইল সারা এবং হোটেল ও রেস্টুরেন্টের কাজ ইত্যাদি করে থাকে। এইসব শিশুরা শোষিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে, এদের দিয়ে জোরপূর্বক কাজ করানো হয়ে থাকে যেমন জোর করে ভিক্ষা করানো বা চোরাচালানি বা মাদকদ্রব্য বিক্রির কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

শিশুদেরকে প্রায়ই অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করানো হয়ে থাকে যেমন অনিবন্ধিত গার্মেন্ট, রাস্তার যানবাহনে, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা প্রদানকারি শিল্পে।

ডিপার্টমেন্ট অব লেবর এর ফাইন্ডিংস অন দ্যা ওয়ার্স্ট ফর্মস অফ চাইল্ড লেবর দেখুনঃ www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/

ঘ। চাকুরী বা পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য

শ্রম আইন অনুযায়ী লিঙ্গ বা শারিরিক অক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পারিশ্রমিক এর বৈষম্য নিষিদ্ধ, তবে লিঙ্গ, শারিরিক অক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান বা এরকম কিছু বিষয়ের উপর অন্যান্য বৈষম্যের ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ বা জন্মস্থান এর উপর ভিত্তি করে কোন ধরনের বৈষম্যমুলক আচরণ করতে পারে না, এবং খুব স্পষ্টভাবে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে; আইন সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবার সুযোগ করে দিয়েছে।

কম পারিশ্রমিকের গার্মেন্ট সেক্টরে মহিলাদের কাজের সুবিধা বেড়েছে। গার্মেন্ট সেক্টরে বেশিরভাগ কর্মীই মহিলা তবে তাদের কাজের পরিধি ফ্যাক্টরি ফ্লোরেই সীমাবদ্ধ থাকছে, অন্যান্য আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজে তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। ফ্যাক্টরিতে অনেক সময় মেয়েরা যৌন হয়রানি সহ নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হয়। সর্বোপরি অর্থনীতিতে কিছু ক্ষেত্রে লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য দেখা গিয়েছে, তবে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ছেলে ও মেয়েদের পারিশ্রমিকের তুলনা করা যায়।

একই ধরনের কাজের জন্য গার্মেন্ট সেক্টরে ছেলে ও মেয়েদের পারিশ্রমিক সমান, তবে সুপারভাইজরি ও ম্যানেজমেন্ট পদগুলোতে মেয়েদের উপস্থিতি খুবই কম। কিছু ধর্মীয়, আদিবাসী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু লোকজন বৈষম্যের অভিযোগ করেছে, বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টরে (সেকশন ৬ দেখুন)।

ঙ। কাজের গ্রহণযোগ্য শর্ত বা পরিবেশ

ন্যাশনাল মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড সেক্টর-বাই-সেক্টর ভিত্তিতে, অর্থ্যাত, প্রতিটি সেক্টরের জন্য সর্বনিম্ন মাসিক বেতন নির্ধারিত করে দিয়েছে। বোর্ডটির সভা যেকোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে তবে সাধারণত এটি প্রতি পাঁচ বছরে ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন করে যেখানে প্রতি প্রকারের শিল্পের জন্য বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুবিধা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আইন অনুযায়ী সরকার বর্তমান বেতন কাঠামোকে চাকুরীদাতা ও কর্মীদের সাথে আলোচনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার মাধ্যমে পরিমার্জন বা সংশোধন করতে পারে। ২০১৩ সালে গার্মেন্ট শিল্পে, বোর্ড সর্বনিম্ন মাসিক বেতন ৫,৩০০ টাকা (৬৬ ডলার) নির্ধারন

করেছে। পোষাক সেক্টরের বেতন প্রায়ই সর্বনিম্ন বেতনের চাইতে বেশি হয়ে থাকে এবং ইপিজেডসমূহে সাধারণ বেতনের মানের চাইতে বেশি বেতন দেয়া হয়ে থাকে। সর্বনিম্ন বেতন যেসব সেক্টরে দেয়া হয় তাদের মধ্যে সবচাইতে কম দেয়া হয় চা প্যাকেটজাত করার কাজে, দিন প্রতি ৬৯ টাকা (০.৮৬ ডলার), যা কিনা মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে ২০১৩ সালে নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত সর্বনিম্ন বেতন শহরাঞ্চলে বসবাস করার জন্য নিতান্তই অপর্যাপ্ত। সর্বনিম্ন বেতন মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করা হয় না (বছরে গড়ে ৭ থেকে ৮ শতাংশ), তবে বোর্ড কখনো কখনো কিছু সেক্টরে জীবনযাত্রার খরচ এর সাথে বেতনের সমন্বয় সাধন করে থাকে।

আইন অনুযায়ী, আট ঘন্টায় এক কর্মদিবস হিসেবে গণ্য করা হয়। একটি আদর্শ কর্মসপ্তাহ হল ৪৮ ঘন্টা, তবে এটি ৬০ ঘন্টা পর্যন্ত বাড়ানো যায়, সেক্ষেত্রে বাড়তি কাজের (ওভারটাইম) জন্য বাড়তি মজুরি দিতে হবে যা কিনা স্বাভাবিক মূল বেতনের মানের চাইতে দ্বিগুন। ওভারটাইম কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কর্মীদেরকে আট ঘন্টার বেশি কাজের ক্ষেত্রে এক ঘন্টার কর্মবিরতি বা বিশ্রাম ও পাঁচ ঘন্টার বেশি কাজের জন্য আধা ঘন্টার কর্মবিরতি দিতে হবে। ফ্যাক্টরির কর্মীদের প্রতি সপ্তাহে এক দিন ছুটি পাওয়ার কথা। দোকান পাটে কাজ করা কর্মীরা সপ্তাহে দেড় দিন (এক দিন পুরো ও এক দিন অর্ধেক) ছুটি পায়। আইন অনুযায়ী পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার একটি নির্দিষ্ট মান আছে এবং এই আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনীতে কর্মীদের জন্য একটি নিরাপত্তা কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক।

ফ্যাক্টরিগুলোতে কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি (অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ, ওএসএইচ) গঠনের প্রক্রিয়া শ্রম আইনে লিপিবদ্ধ করা আছে। এই কমিটিতে ফ্যাক্টরির ম্যানেজমেন্ট ও ইউনিয়ন বা ডব্লিউপিসি দ্বারা নির্ধারিত কর্মী উভয় পক্ষই উপস্থিত থাকবে। যেখানে কোন ইউনিয়ন বা ডব্লিউপিসি নেই সেখানে শ্রম মন্ত্রণালয় কর্মীদের মধ্যে নির্বাচনের আয়োজন করে প্রতিনিধি নির্ধারণ করবেন।

সরকার সকল সেক্টরে সর্বনিম্ন বেতন, কর্মঘন্টা এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড বা মান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে নি। যদিও গার্মেন্ট শিল্পে মনোযোগের ফলে এই সেক্টরে কিছু ফ্যাক্টরিতে কমপ্লায়েন্স এর মান উন্নত হয়েছে, তবে সর্বোপরি সকল সেক্টরে রিসোর্সেস, তদন্ত ও প্রতিকার ব্যাবস্থা যথেষ্ট নয়, আবার নিয়ম ভঙ্গের যে শাস্তি সেটাও অনিয়ম বন্ধের জন্য যথেষ্ট নয়।

২০১৩ সালে রানা প্লাজার ধসে ১,১৩৮ জন কর্মী নিহত হয়েছে এবং ২,৫০০ জনেরও বেশি কর্মী আহত হয়েছে। জুলাই আসে কর্তৃপক্ষ বিল্ডিং কোড ভঙ্গের দায়ে ছয়জনের জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে, যাদের মধ্যে ভবনের মালিক সোহেল রানা ও স্থানীয় মিউনিসিপাল চীফ এক্সিকিউটিভ ও আছেন। কোর্ট একটি ভিন্ন অভিযোগপত্র পুলিশের কাছে ফেরত পাঠায় কেননা কোর্ট মনে করে যে এতে এই ঘটনার সাথে জড়িত সরকারের সকল কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নভেম্বরের শুরুর দিক পর্যন্ত রানা পুলিশের কাস্টডিতে ছিল। ভবন ধসের পরে, কিছু প্রাইভেট কম্পানি, বিদেশি সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সরকারের সাথে কাজ করে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩,৬৬০টি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে তদন্ত পরিচালনা করে, যার ফলশ্রুতিতে ৩৭টি ফ্যাক্টরি মানব জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। অনেক ফ্যাক্টরিতে নিরাপত্তা ব্যাবস্থা উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়।

ওয়ার্কার্স গ্রুপ জানিয়েছে যে আইন যে ওএসএইচ এর মানদন্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে তা যথেষ্ট এবং অনেক ফ্যাক্টরি এখন সেই মান অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। কমপ্লায়েন্স এর নিয়ম না মানার জন্য আইন সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা (৩১৩ ডলার) জরিমানা নির্ধারণ করেছে তবে এর ফলে আইন ভঙ্গ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না।

কর্মঘন্টার যে আইনত সীমা সেটা সবসময়ই ভঙ্গ করা হচ্ছে। রেডি-মেইড গার্মেন্ট সেক্টরে, রপ্তানি করার ডেডলাইন রক্ষা করা, বা সময়মত রপ্তানি করার জন্য চাকরিদাতারা প্রায়ই কর্মীদের দিনে ১২ ঘন্টা বা এর বেশি সময় কাজ করায়, অথচ তারা সবসময় কর্মীদের এর জন্য যোগ্য প্রতিদান দেয় না। সলিডারিটি সেন্টারের তথ্য মতে, শ্রমিকরা অনেক সময় নিজের ইচ্ছাতেই আইনানুগ সীমার বাইরে গিয়ে ওভারটাইম কাজ করে থাকে। বেতন দিতে দেরি করা বা ছুটির সুবিধা পুরোপুরি না দেয়া চাকুরিদাতাদের মধ্যে খুব সাধারণ ঘটনা। এদিকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের তদন্তের রিপোর্টে ওভারটাইমের বিষয়ে কোন অনিয়মের তথ্য নেই।

অনেক কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অবস্থা নিতান্তই দুর্বল, তবে সলিডারিটি সেন্টার ও অন্যান্য সংস্থা গার্মেন্ট সেক্টরে নিরাপত্তার ব্যাবস্থা জোরদার করার কথা জানিয়েছে। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর তথ্য অনুযায়ী ৩০টি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে তবে নভেম্বর পর্যন্ত এতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, যা ২০১৪ সালের আগুন লাগার ১৫২টি ঘটনার সাথে তুলনীয়।

সেপ্টেম্বর মাসে, কোর্ট ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে, যাদের মধ্যে তাজরিন ফ্যাশনসের মালিক দেলোয়ার হোসাইন ও অন্তর্ভুক্ত। এই ফ্যাক্টরিতে ২০১২ সালে আগুন লেগে ১১২ জন কর্মীর মৃত্যু হয়।

কিছু নির্ভরযোগ্য শ্রম বিষয়ক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় যেখানে বিশাল অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর নিয়ে তথ্য আছে, এই সব সেক্টরেই দেশের বেশিরভাগ নাগরিক কাজ করে, এবং এখানে শ্রম আইনের প্রয়োগ ঘটানো খুবই কঠিন। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিস্টিক্স, লেবর ফোর্স সার্ভেতে রিপোর্ট করে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে দেশের ৫৬.৭ মিলিয়ন কর্মীর মধ্যে ৪৭.৩ মিলিয়ন কর্মী কাজ করে।